ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬২ বর্ষ ১৪ সংখ্যা ।। ১৪ অগ্রহায়ণ, ১৪১৬ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১১) ৩০ নভেম্বর, ২০০৯ ।। Website : www.eswastika.com

বামেরা শাঁওলি নিয়ে সরব কিন্তু অন্যদের বিষয়ে নীরব

গূঢ়পুরুষ।। রেলের হেরিটেজ কমিটির চেয়ারপার্সন পদে ৫০ হাজার টাকা মাসিক ভাতায় নাট্যব্যক্তিত্ব শাঁওলি মিত্রকে নিয়োগ করা নিয়ে তৃণমূল নেত্রী এবং কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে সিপিএম নেতাদের চাপান-উতোর চলছে। এই নিয়ে সাধারণ মানুষ যথেষ্ট বিভ্রান্ত। মমতা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, রেলমন্ত্রী হিসাবে কোন ব্যক্তিকে রেলের কমিটির কোন পদে নিয়োগ বা মনোনয়ন করা হবে সেটা তাঁর দপ্তরের নিজস্ব ব্যাপার। এক্ষেত্রে সি পি এম নেতাদের পরামর্শ দেওয়ার এক্তিয়ার নেই। অন্যদিকে, আলিমুদ্দিন থেকে জোরদার প্রচার চলছে যে মমতার পরিবর্তনের ডাককে সমর্থন করার বিনিময়ে শাঁওলি মিত্র সহ পরিবর্তনপন্থী বুদ্ধিজীবীদের রেলের বিভিন্ন কমিটিতে উচ্চপদে বসানো হচ্ছে। সাধারণ মানুষের বিভ্রান্তিটা এখানেই। কে ঠিক কথা বলছেন ?

প্রয়াত লালবাহাদুর শাস্ত্রীর পর যখনই যে রাজ্যের সাংসদ রেলমন্ত্রী হয়েছেন তিনি নিজের রাজ্যের স্বার্থই বড় করে দেখেছেন। রেলের কমিটিতে বেছে বেছে তাঁর সমর্থক অনুগতদেরই বসিয়েছেন। একমাত্র লালবাহাদুর শাস্ত্রী রেলকে সর্বভারতীয় সংস্থা হিসাবেই দেখেছিলেন। তাঁর পর দ্বিতীয় কোনও রেলমন্ত্রী রেলকে 'জাতীয় সংস্থা' মনে করেননি। সকলেই রেলকে ব্যবহার করেছেন দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসাবে। মমতা বন্দোপাধ্যায়ও তার ব্যতিক্রম নন। রেলের উন্নয়ন প্রবন্ধের

শাঁওলি মিত্র

৯০ শতাংশই এখন পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ। এতে রাজ্যের মানুষের স্বার্থসিদ্ধি হচ্ছে বলে আমরা উল্লসিত। ভুলে গেছি রেলের সর্বভারতীয় চরিত্র। ঠিক এভাবেই আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য বিহারের মানুষ উল্লসিত হয়েছিল যখন লালুপ্রসাদ যাদব রেলের কর্মকাণ্ড তাঁর বিহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখে ছিলেন। এখন তাঁরা হাত কামড়াচ্ছেন। সি পি এম নেতারা এতকাল সব জেনেও নীরব ছিলেন। তাঁদের মনে হয়নি প্রাক্তন রেলমন্ত্রী লালুপ্রসাদ পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি করছেন। হঠাৎ এখন ঘুম ভেঙে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে চিৎকার করছেন যে মমতা পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি করছেন।

অবশ্যই মমতা রেলের মাধ্যমে পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি করছেন। রেলের হেরিটেজ কমিটির নাম বা অস্তিত্বের কথা কতজন এর আগে শুনে ছিলেন। সম্ভবত রেলযাত্রীদের এক শতাংশও নয়। রেলের এই হেরিটেজ কমিটির কাজটাই বা কী—সে সম্পর্কে বিশেষ কিছু অনেকেই জানেন না। অথচ এটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটি যেখানে চেয়ারপার্সনের মাসিক ভাতাই হচ্ছে ৫০ হাজার টাকা। যেখানে প্রতিদিন কাজের চাপ ততটাই যে শাঁওলি মিত্রকে নাট্য জগৎ থেকে সরে এসে পুরো সময় এই কমিটিকে দিতে হচ্ছে। চেয়ারপার্সনের মাসিক ভাতা যদি ৫০ হাজার টাকা হয় তবে কমিটির অন্যান্য সদস্যদেরও নিশ্চয় মোটা মাসিক ভাতা আছে। আমি অকপটে স্বীকার করছি এই অতি গুরুত্বপূর্ণ রেলের কমিটির অন্যান্য সদস্যদের ভাতা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানি না। সি পি এম নেতারাও সে সম্পর্কে কিছু জানাননি। কারণ, তাঁদের লক্ষ্য মমতা বিরোধী রাজনীতি করা। তাই শাঁওলি মিত্র টারগেট। হেরিটেজ কমিটির কাজকর্ম নিয়ে তাঁদের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই।

পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতিতে সি পি এম সবার আগে সে কথাটি রাজ্যবাসীর অজানা নয়। দলের চুনোপুটি থেকে রাঘব বোয়াল

(এরপর ২ পাতায়)

উপকূলবাসীদের অনেকেরই ভারতীয়ত্বের প্রমাণ নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুন্দরবন সংলগ্ন উপকূলীয় গ্রামগুলিতে বহু বাসিন্দা তাদের ভারতীয় নাগরিক হিসাবে প্রমাণ করতে পারছে না। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশে উপকূলীয় গ্রামগুলির বাসিন্দাদের নাম-ঠিকানা ছবি তুলে রাখা হচ্ছে। তা প্রশাসনের কাছে একটি রেজিস্টারে তুলে রাখা হবে। নাম দেওয়া হয়েছে, ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার। বা এন পি আর। পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার প্রায় ৩০০ উপকূলবর্তী গ্রামে এই নাম তোলার কাজ চলছে। প্রায় ১৮ লক্ষ বাসিন্দার নাম তোলা হবে। পূর্ব মেদিনীপুরে ৭০ টিরও বেশি গ্রামে এই কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। এই জেলায় ভারতীয় নাগরিক প্রমাণে তেমন গড়িমসি হয়নি। কিন্তু দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগণার গ্রামগুলিতে মাত্র এক লক্ষ বাসিন্দার নাম তোলা সম্ভব হয়েছে। মন্ত্রকের কর্মীরা উপকূলীয় এলাকায় শেষ ছ'মাস যাবৎ যারা টানা বসবাস করছেন তাদের নাম তোলার জন্য বাড়ি বাড়ি গেলে বহু রহস্যজনক ব্যক্তি বা পরিবারের উপস্থিতি নজরে পড়েছে। কিন্তু তাদেরও নাম ঠিকানা লিখে আনা হচ্ছে। সেগুলি যাচাই করে প্রকৃত ভারতীয়দের নাম তোলা হবে। গত বছর মুম্বাইয়ে জঙ্গিরা হামলা চালানোর পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এই কাজটি হাতে নেয়। এন ডি এ আমলে লালকৃষ্ণ আদবানী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালীনই এই প্রকল্পের সূচনা। পাইলট প্রকল্পে মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ এবং মুর্শিদাবাদ ব্লকে সমীক্ষা হয়। তাতে প্রথম দফায় ৬০ শতাংশ নাগরিক নিজেদের ভারতীয় বলে প্রমাণ করতে পারেনি। পরে ইউ পি এ সরকার ক্ষমতায় এসে আদবানীর প্রজেক্ট নিয়ে আর এগাতে চায়নি। কিন্তু মুম্বাই হামলা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরনের চোখ খুলে দিয়েছে। সেই কারণেই দেশের উপকূলভাগে সমস্ত গ্রামে বাসিন্দাদের নাম ঠিকানা লিখে রাখা শুরু হয়েছে। সেই কাজের সূত্র ধরেই দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগণার সমীক্ষা। তাতে বহু মানুষ নিজেদের আসল পরিচয়, গোপন করছে অথবা ঠিক পরিচয় দিতেই পারছে না। সমীক্ষা করা অবশ্য এখনই এদের কিছু বলছে না। তথ্যপঞ্জি সংগ্রহ শেষে বিশ্লেষণ পর্বের পর একটি সন্দেহজনক আবাসিকদের তালিকা তৈরি হবে বলে জানা গিয়েছে।

ইউরেনিয়াম থেকে উইগুর ভারতের বিরুদ্ধে ঘুঁটি সাজাচ্ছে চীন

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ভারতের সমস্ত প্রতিবেশী দেশগুলোতে চীনা অনুপ্রবেশ অব্যাহত। এবার চীন চেষ্টা করছে উইগুর মুসলমানদের ভারতে অনুপ্রবেশ করাতে। অন্যদিকে পাকিস্তানকে একনাগাড়ে ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদে মদত দিয়ে যাবার পাশাপাশিই 'ভুট্টো-ইন্দিরা' জমানায় পাক বিজ্ঞানী আব্দুল কাদির খানের একটি চাঞ্চল্যকর চিঠি জনসমক্ষে এসেছে। তাঁর স্ত্রীকে লেখা চিঠিতে কাদির বলেছেন—"চীন আমাদের (পাকিস্তানকে) নিউক্লিয়ার অস্ত্রশস্ত্রের নকশা দিয়েছে। এমনকী অস্ত্র তৈরির জন্য ৫০ কেজি সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম পর্যন্ত দিয়েছে।" মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামার চীন সফরের প্রাক্কালে প্রকাশ্যে আসা এই চিঠি মার্কিন প্রশাসনকে কোনও অস্বস্তির মধ্যে ফেলতে পারেনি। কারণ এর পরেও গলা উঁচু করে ওবামা বলেছেন, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিকে মনিটরিং (পড়ুন দাদাগিরি) করবে চীন। আমেরিকার সহযোগিতায় চীন যে এখন আরও বেশি করে ভারতের বিরুদ্ধে

কাদির

হু-জিন-তাও

পরমাণু অস্ত্র প্রয়োগে পাকিস্তানকে উৎসাহ যোগাবে—তা এখন দিনের আলোর মতই পরিষ্কার।

অন্যদিকে, কয়েকমাস আগে জিন-জিয়াং-এ উইগুরদের সঙ্গে হান-চীনাদের যে সংঘর্ষ হয়েছিল এবং তার ফলে মুসলিম দুনিয়ার সাথে তাদের যে সম্পর্কের অবনতি হয়েছিল তার থেকে চোখ ফেরাতে উইগুরদের ভারতে ঢোকানোর পরিকল্পনা নিয়েছে চীন। এর ফলে একদিকে যেমন মুসলিম দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে তা মেরামত করা যাবে, অপরদিকে ভারতের গলায় ফাঁসটা আরও বেশি করে চেপে বসানো যাবে বলে মনে করছে চীন। এই মুহূর্তে হান-চীনাদের সঙ্গে উইগুরদের মৈত্রী চুক্তি হওয়ার ন্যূনতম কোনও সম্ভাবনাই নেই। গত ৫ই জুলাই উরুমকিতে যে সংঘর্ষ হয়েছিল তাতে ১৯৭ জন মারা যান, আহত হন ১৭২১ জন উইগুর। মানবাধিকার কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুসারে ৪৩ জন উইগুর এখনও নিখোঁজ।

(এরপর ২ পাতায়)

তসলিমাকে কলকাতায় থাকতে দেওয়া হোক : অম্লান দত্ত

বাঁদিক থেকে কালীকৃষ্ণ গুহ, ডঃ অম্লান দত্ত, শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায় ও রবীন মণ্ডল।

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার এবং কেন্দ্রে কংগ্রেস পরিচালিত ইউ পি এ সরকারের মেকী ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশটা খুলে দিলেন বিতর্কিত ও নির্বাসিত বাংলাদেশী লেখিকা তসলিমা নাসারিন। গত ২০ নভেম্বর কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্যারিস থেকেই টেলিফোনে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন তসলিমা। তিনি বলেন ভারত সরকার তাঁকে যে ভিসা মঞ্জুর করেছে তার অলিখিত শর্তই হলো তাঁর ভারতে থাকা চলবে না। তবে তিনি ভারতে এবং বিশেষ করে কলকাতায় থাকতে চান আন্তরিকভাবে। এমনকী সরকারি স্তরে আশ্বাস পেলে তিনি বাংলাদেশেও যেতে রাজী।

ক্যাম্ব (ক্যাম্পেন এগেন্স্ট এট্রোসিটিজ্ অন দি মাইনরিটিজ্ অফ্ বাংলাদেশ), 'একুশ শতক' পত্রিকা এবং আরও একটি সংস্থার উদ্যোগে ওইদিন কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন ও সভার আয়োজন করা হয়েছিল। আয়োজকদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ অম্লান দত্ত, কবি শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায়, চিত্রকর রবীন মণ্ডল ও কবি কালীকৃষ্ণ গুহ। শরৎবাবু বলেন, কিছু বুদ্ধিজীবী ও উর্দুভাষী মুসলমানদের চাপে তসলিমাকে তাড়ানো হয়েছে কলকাতা থেকে। অম্লান দত্তের বক্তব্য ছিল, 'তসলিমা সাহিত্যিক, লেখিকা—তাঁরও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে। তিনি কলকাতায় স্বাগত। তাঁকে এখানে থাকতে দেওয়া হোক।' তসলিমা বুদ্ধিজীবীদের এই উদ্যোগকে প্যারিস থেকে ফোনে স্বাগত জানিয়েছেন।

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!
SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life সীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।
যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist, Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।
যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন –
Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221
SBI Life
INSURANCE
With Us, Your's Sure

নেপালে চীনের ভারতবিরোধী কার্যকলাপ

সংবাদদাতা ঃ ভারতের বহিঃদেশীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' সতর্ক করে দিয়েছে, নেপালের নেপাল-চীন স্টাডি সেন্টারগুলিকে চীন চরবৃত্তির কাজে ব্যবহার করছে। সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা স্বীকার করেছেন, 'র' ইতিমধ্যে এই বিষয়টি সরকারকে জানিয়ে দিয়েছে। ভারত-নেপাল সীমান্তে এই নেপাল-চীন স্টাডি সেন্টারগুলি রয়েছে। ভারতের খবর গোপনে সংগ্রহ করছে এই স্টাডি সেন্টারগুলি। 'র' এ ধরনের ২৪টি সেন্টারকে চিহ্নিত করেছে। এদের মধ্যে অধিকাংশই নেপাল-ভারত সীমান্তে। কেবল এই সেন্টারগুলিই যে চরবৃত্তিতে জড়িত, তা নয়। নেপালের আনুমানিক ৩০টি চাইনিজ ফার্মও ভারতের বিরুদ্ধে চরবৃত্তিতে লিপ্ত রয়েছে বলে 'র'-এর সন্দেহ।

নেপালে নিজেদের প্রভাব বাড়াতে প্রভূত চেষ্টা করছে চীন। নেপালকে সামরিক ও আর্থিকভাবে সহযোগিতা করার প্রস্তাব দিয়েছে বেজিং। গত মাসে নেপালে নিযুক্ত বেজিংয়ের রাষ্ট্রদূত কিউয়ো গুয়োহাং বলেছেন, যদি নেপালের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা কোনও ধরনের হুমকির সম্মুখীন হয় তা হলে চীন কেবল সামরিক নয়, অর্থনৈতিক এবং কূটনৈতিকভাবেও সহযোগিতা করবে। ভারতের সঙ্গে নেপালের উন্মুক্ত সীমান্তের পাশেই অধিকাংশ নেপাল-চীন স্টাডি সেন্টার। ভারত কূটনৈতিক স্তরে নেপালের সঙ্গে বিষয়টি আলোচনা করবে। গত দু'বছরে নেপালের সামনে ভারতের বিকল্প হিসেবে নিজেদের উপস্থাপন করছে বেজিং। লাসা ও কাঠমাণ্ডুর সংযোগকারী হাইওয়ে ১০০ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে নির্মাণ করছে বেজিং। নেপাল ও চীনের মধ্যে সামরিক সহযোগিতা বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ১.৩ মিলিয়ন ডলার মূল্যের সামরিক প্যাকেজ নেপালকে প্রদান করার কথা ঘোষণা করেছে চীন।

শাঁওলিকে নিয়ে সরব

(১ পাতার পর)

সব ধরনের নেতারাই পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতিকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সরকারি আধা সরকারি সংস্থার শীর্ষে পার্টির প্রসাদধন্য ব্যক্তিরা গত তিন দশক ধরে ক্ষমতার লাঠি ঘোরাচ্ছে। প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ সবই হয় আলিমুদ্দিনের নির্দেশে। পার্টি বিনা গীত নেই। পার্টির ভজনা ছাড়া গতি নেই। সেই পার্টি নেতারাই এখন মমতার বিরুদ্ধে পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি করার অভিযোগ করছেন। চমৎকার! সি পি এম নেতাদের গলাবাজি শুনে সেই আপ্তবাক্যের কথা মনে পড়ছে, 'চোরের মায়ের বড় গলা।' পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে দলদাস করাই যে পার্টির একমাত্র রাজনীতি তাদের এমন গলাবাজি শোভা পায় না।

এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে পরিবর্তনপন্থী বিশিষ্টজনদের বেছে বেছে রেলের কমিটিতে নিয়োগ আদতে সেই সি পি এম মার্কা পাইয়ে দেওয়ার নীতি ছাড়া অন্য কিছু নয়। মমতা নিজেই বলেছেন এই নীতি সি পি এমের। তাই সি পি এম যদি চালুনি হয় তবে তাঁর তৃণমূল সূচ। তাই শতছিদ্র চালুনি পার্টি এবং সছিদ্র সূচ পার্টি উভয়ের কাছেই রাজ্যের উলুখাগড়া জনগণের কাতর আবেদন যে তারা তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন কমিটিতে 'দলদাস' সদস্যদের তালিকা প্রকাশ করুক।

ঘুঁটি সাজাচ্ছে চীন

(১ পাতার পর)

হান-চীনাদের সন্তুষ্ট রেখেই চীন চাইছে উইগুরদের সম্মানজনক একটা পুনর্বাসনের চেষ্টা করা। এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতাবশে উইগুররাও চীনা প্রশাসনের পাশে থাকবে—এমনটাই ভাবছে চীন।

তবে তাদের এই ভাবনার কথা প্রকাশ্যে বলছেনা চীন। বরং হু-জিনতাও উইগুর বনাম হান-চীনা দাঙ্গার অব্যবহিত পরেই জি-৮ সম্মেলন থেকে তড়িঘড়ি ফিরে এসে জিনজিয়াং প্রদেশের প্রায় দু'কোটি ইন্টারনেট যোগাযোগ ছিন্ন করে দেন। এরপরেই ওখানে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জোর দেবার কথা মুখে বলেন তিনি। কিন্তু তারপর মাস পাঁচেক হয়ে গেলেও অর্থনৈতিক উন্নয়ন তো দূরের কথা—উইগুরদের এমন হাল করেছে হু-জিনতাও প্রশাসন, যাতে তারা ওই এলাকা ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। জিনজিয়াং-এর এক উইগুর যুবক ইব্রাহিম বলছে—"শ'য়ে শ'য়ে ইন্টারনেট ব্যবসা দেউলিয়া হয়ে পড়েছে। সুতরাং যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা তাঁরা বলছেন সেটা কোথায় গেল? আমি ভারতে যেতে চাই। আমি ব্যবসায় এখানে কোনও বিনিয়োগ করতে চাই না। আমি এবং আমার বন্ধুরা ভারতে যাবার রাস্তা (লেহ্ দিয়ে) খুঁজছি। কিন্তু চীন একটা নজরদারি রাখছেই।" ইব্রাহিমের আরও বক্তব্য—"জেলের মধ্যে হাজার হাজার ছেলে পচছে। তারা দাঙ্গার সঙ্গে আদৌ যুক্ত ছিল না। তারা সকলেই যুবক এবং মুসলিম।" (টাইমস্ অব্ ইন্ডিয়া, ১৪ই নভেম্বর, ০৯)।

বোঝাই যাচ্ছে মুসলিমদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভকে সামাল দেওয়ার জন্য ও তাদেরকে ভারতবিরোধী কাজে লাগাবার এই মওকাটাই নিতে চাইছে হু-জিনতাও প্রশাসন। চীন সরকার তাদের সুকৌশলে ভারতে অনুপ্রবেশ করাবে বলে ভেবেছে এবং তারপর ইব্রাহিমের কথামতো ভারতে টাকা বিনিয়োগ করার মাধ্যমে হয় জাল নোট ছড়িয়ে নয়তো শেয়ারমার্কেটে লগ্নি করে এদেশের অর্থনীতিকে অস্থির করে তুলবে অনুপ্রবেশকারী উইগুররা। অন্যদিকে উইগুররা জিনজিয়াং থেকে অপসারিত হলে সন্তুষ্টও হবে হান-চীনারা। বেজিং এইভাবেই এক ঢিলে দুই পাখি মারার চেষ্টা করছে। তারা চাইছে ভারত বিরোধী স্বার্থে পাকিস্তান ও উইগুরদের মিলিয়ে দিতে। আব্দুল কাদিরের চিঠি প্রকাশ্যে আসার পর বোঝাই যাচ্ছে চীনের পাকিস্তানকে সাহায্য করা কোনও নতুন ঘটনা নয়। সম্প্রতি কাশ্মীর সহ বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক ইস্যুতে পাকিস্তানের কোলে ঝোল টেনে কথা বলেছে চীন। চীনা ড্রাগনের লেলিহান জিহ্বা এখন অরুণাচল, সিকিমের মতো সীমা-সংলগ্ন ভারতীয় অঙ্গ রাজ্যগুলি উদরস্থ করতে চাইছে। দলাই লামার অরুণাচল সফর নিয়ে চীনের হুংকার তারই বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করা হচ্ছে। আমেরিকার মদত চীনকে আরও শক্তিশালী করেছে। ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণের যাবতীয় রসদই চীন মজুত করছে মূলত পাকিস্তানের মাধ্যমে। যা ভারতের বিরুদ্ধে পরমাণু অস্ত্র প্রয়োগে পাকিস্তানকে উৎসাহ দেওয়ারই নামান্তর। এর সঙ্গে উইগুরদের স্বার্থকে জুড়ে দেওয়া মানে তো রাহু-কেতুর যৌথ মিলন ঘটানো।

এই সময়

মন্দ কপাল

সত্যি কি কপাল করেই না এসেছে দু'নম্বরী ইউ পি এ সরকার। একদিকে লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি, অন্যদিকে ফসলের ঠিকমতো দাম না পেয়ে কৃষকের মৃত্যু মিছিল। এর সাথে গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো যুক্ত হয়েছে বাইরে থেকে চাল আমদানি। গত বিশ বছরের মধ্যে যা প্রথমবারের জন্য ঘটল। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের শুরুতেই দেশের অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, যদিও বাড়তি কিছু পরিমাণ চাল এখনও মজুত রয়েছে কিন্তু খরিফ শস্য কম উৎপাদনের কারণে বাইরে থেকে চাল কিনতেই হবে। সুতরাং চালের মূল্যবৃদ্ধি অথবা কোষাগারের ভর্তুকি—কোনও একটা নিশ্চিত হচ্ছেই। এমন মন্দ কপাল নিয়ে বাঁচা যায়? আপনিই বলুন!

বিদায় ই-মেল

ই-মেলের মতো সংযোগের এত ঢিমেতালে মাধ্যম, এত ঝামেলাবাজ, সহজ কথায় বললে, কেতা-দুরস্তহীন এমন আর কিছু আছে নাকি? নির্ঘাৎ ভাবছেন এই গেঁয়ো, অশিক্ষিতটা কোত্থেকে উদয় হলো? তবে জেনে রাখুন এই ধরনের চিন্তাভাবনা কোনও গেঁয়ো বা অশিক্ষিত লোক করছে না, করছেন বিলেতের কেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক নৃতত্ত্ব বিভাগের গবেষকরা। তাঁরা ও ইংল্যাণ্ডের ব্রডব্যান্ড সংস্থা 'টকটক' একটি সমীক্ষায় দেখেছে যে ৫১ শতাংশ ব্রিটিশ টিন-এজাররা ই-মেলের পক্ষপাতী হলেও বাকিরা বলছেন ই-মেলের তুলনায় ফেসবুক বা টুইটারের মাধ্যমে অনেক দ্রুত যোগাযোগ করা যাচ্ছে। অগত্যা, আগামী দশ বছরের মধ্যে বিদায় ঘটতে পারে ই-মেল নামক সংযোগ মাধ্যমের, এমনটাই অনুমান বিশেষজ্ঞদের।

ধন্য মুকেশ

আর্থিক মন্দার ধাক্কা সামলাতে পারেনি বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম রাসায়নিক সংস্থা লিওন্ডেল বাসিল। এ বছরের গোড়ায় জানুয়ারিতে কোম্পানীটি নিজেকে দেউলিয়া বলে ঘোষণা করেছিল। সেই লিওন্ডেল-বাসিলকে কিনে নিতে চলেছে ভারতের বৃহত্তম কর্পোরেট সংস্থা মুকেশ আম্বানীর রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। এরজন্য রিলায়েন্স কত টাকা দিচ্ছে তা না জানা গেলেও, সংশ্লিষ্ট একজন মার্চেন্ট ব্যাঙ্কারের কথায়, এর জন্যে কমপক্ষে ১২ বিলিয়ন ডলার খরচা তো করছেই মুকেশের সংস্থা। বার্ষিক টার্নওভারের ক্ষেত্রে রিলায়েন্স-এর তুলনায় লিওন্ডেলবেসিলের বিনিয়োগের পরিমাণ যথেষ্টই বেশী। এখন লোকসানে চলা এই রাসায়নিক সংস্থাটিকে রিলায়েন্স লাভজনক করতে পারে কিনা সেটাই দেখার।

ভিটের টান

তিনি মহানায়িকা। বহুদিন যাবৎ অন্তরালবাসিনী। বলা নিষ্প্রয়োজন—তিনি বাঙালীর লেডি অব্ শ্যালট সুচিত্রা সেন। পাবনায় তাঁর পৈতৃক ভিটে সংরক্ষণে উদ্যোগী হয়েছেন বাংলাদেশ সরকার। সুচিত্রার বাবা করুণাময় দাশগুপ্তের পাবনার বাড়িটি এখন জামাতে ইসলামির দখলে। এলাকার মানুষের চাপে বাংলাদেশ সরকার সুচিত্রার সেই বাড়িতে একটি পরিপূর্ণ সংগ্রহশালা গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে। সুচিত্রা-প্রেমে পাগল স্থানীয় মানুষের আশা, বাড়িটি জামাতে ইসলামি অবিলম্বে সরকারের হাতে তুলে দেবে এবং তারপরেই সরকার সংগ্রহশালার কাজ শুরু করে দেবে। সবই ঠিক আছে, কেবলমাত্র জামাতে ইসলামি এই ব্যাপারগুলো মানলে হয়!

'তোলা' বাড়ল

যে রেটে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে দেশদ্রোহিতা। এর খরচ-খরচার কথাটা অন্তত জনগণের ভাবা উচিত! অবশ্য জনগণ তা না ভাবতে চাইলেও মাওবাদীরা তা ভাবিয়েই ছাড়ছে। পশ্চিমবঙ্গ সহ সাত রাজ্যের উপদ্রুত অঞ্চলে এতদিন পর্যন্ত শিল্পপতি-ব্যবসায়ী ও চাকুরীজীবীদের কাছ থেকে তাঁদের বেতন বা মোট আয়ের ৭-১০ শতাংশ হারে তোলা আদায় করত মাওবাদীরা। এখন খরচাপাতি বাড়ায় সেই তোলার পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ৯-১২ শতাংশ, আর তাতেই এখনও পর্যন্ত ১৫০০ কোটি টাকা উপার্জন করে ফেলেছে মাওবাদীরা। ইস্, উপার্জন করা এত সহজ জানলে মাও-জে-দং নিশ্চয়ই কমিউনিস্ট হতে চাইতেন না!

আঘাত না প্রত্যাঘাত?

লালগড়ের মাওবাদীদের এতবড় আঘাত কেন্দ্র-রাজ্যের যৌথবাহিনীও করতে পারেনি। যেটা করেছেন কমিউনিস্ট পার্টি অব্ চীনের এক উচ্চপদস্থ নেতা। নাম-এই পিং। মাও জে দং-এর দেশে দাঁড়িয়ে তিনি বলে ফেলেছেন—"এই মাওবাদীরা নিছক সন্ত্রাসবাদী ছাড়া আর কিছুই নয়। চীনের কোনও অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক সাহায্য তারা পাবে না।" কিন্তু পিং-এর এই বক্তব্য আদৌ মাওবাদীদের আঘাত করার জন্য নাকি তা ভারতের বিরুদ্ধেই প্রত্যাঘাতের কৌশল কিনা তা বুঝতেই এখন হিমসিম খাচ্ছেন দিল্লীর বিশেষজ্ঞ মহল। বিশেষ করে সিপিএমের চীন-নিন্দার মধ্যে একটা সামগ্রিক গট-আপ গেমের আভাস খুঁজে পাচ্ছেন রাজধানীর অনেকেই।

থোতা মুখ ভোঁতা

কারা কারা যেন রটাচ্ছিল—গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর কবলে নাকি সারা বিশ্ব? তাদের থোতা মুখ ভোঁতা করে দিয়েছে মধ্য নভেম্বরী ঠাণ্ডা। এদের আরও উৎসাহ যুগিয়েছিল এই মাসেরই ১৫ তারিখে তাপমাত্রার অকস্মাৎ বৃদ্ধি। তারপর এইস্যা ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে যে বলার কথা নয়। গত ২২শে নভেম্বর ছিল বিগত দশবছরের মধ্যে নভেম্বর মাসের সবচেয়ে শীতলতম দিন। বিশেষজ্ঞরা এর মধ্যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর একটা কু-প্রভাব দেখতে পেলেও শীতে জবুথবু বাঙালী সেসব পাত্তা দিতে নারাজ। পাছে লেপ-আনাজ-নলেন গুড়ের স্বপ্নে বিভোর নিদ্রা টুটে যায়।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ভারত-শিয়রে চীনা শমন

সেই কোন্ কালে বাজপেয়ী সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজ বলিয়াছিলেন, "চীন আমাদের পয়লা নম্বর শত্রু", সেদিন অনেক তাবড় যোদ্ধারা তাঁহাকে উন্মাদ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। আজ চীনের কার্যকলাপে প্রমাণিত হইতেছে জর্জ ফার্নান্ডেজ নন, সেদিন 'বোদ্ধারাই' বুদ্ধিহীন ছিলেন।

চীন শুরু হইতেই দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রবক্তা কংগ্রেস-কম্যুনিস্ট দলীয় সরকারের আমলকেই তাহাদের ভারতবিরোধী কার্যকলাপের সুবর্ণ সুযোগ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে। একটি একজাতি তত্ত্বে নিবেদিত রাষ্ট্রকে অবদমিত করা যেকোনও রাষ্ট্রের পক্ষেই সুবিধাজনক নয়। চীন ভালো করিয়াই জানে যে ভারতে এক বিপুল সংখ্যক ধর্মীয় মানবগোষ্ঠী বসবাস করে যাহারা ভারতীয় জাতীয়তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়, দায়বদ্ধও নয়। তাহারা এমনকী ভারত-মাতাকে পূজা করিতেও অনিচ্ছুক, ভারত মাতাকে বন্দন করার জাতীয় সঙ্গীতেরও তাহারা বিরোধী। আর ভারতীয় জাতিসত্ত্বা হইতে বিচ্ছিন্ন এই বিপুল সংখ্যক সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর ভোটের লোভে কংগ্রেস-কম্যুনিস্টরা ইহাদের তুষ্ট করিয়া চলিতে বাধ্য, চীন তাহা বিলক্ষণ জানে। তাই চীন এই সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক পিতৃভূমি পাকিস্তানকে শুরু হইতেই তাহাদের ভারতবিরোধী কার্যকলাপের সাক্ষী করিয়াছে।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আসিফ জারদারি ক্ষমতায় বসিয়াই এগারো মাসে চারবার চীন ভ্রমণ করিয়াছেন। সর্বশেষ ভ্রমণে চীনকে পাকিস্তানের বন্দর ব্যবহারের সম্পূর্ণ অধিকার অর্পণ করিয়া দিয়াছেন। এবং খোলাখুলি বলিয়াও দিয়াছে 'চীনের শক্তিই পাকিস্তানের শক্তি এবং পাকিস্তানের শক্তিও চীনেরই শক্তি।' অতএব একা রামে রক্ষা নাই, তাহাতে সুগ্রীব দোসর। পাকিস্তান ভারতের জাতশত্রু, এখন তাহার সহিত যোগ দিয়াছে চীন। ইতিমধ্যেই পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে চীন নানান বৃহৎ প্রকল্পে নামিয়া পড়িয়াছে। একটি মেগা পাওয়ার প্রজেক্ট গড়িয়া তুলিতেছে; কারাকোরাম রেঞ্জে একটি হাইওয়ে নির্মাণ করিয়া দিতেছে।

চীন তাহার অশুভ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিতে ভারতকে ক্রমশ চতুর্দিকে তাহার জালে বদ্ধ করিবার পথে অনেকটাই আগাইয়া গিয়াছে। কেমন সেই জাল? 'China International Institute for Strategic Studies (CIISS)-এর Website-এ Zhan Lue'-র লেখা 'If China takes a little action the so-called Great Indian Fedaration can be broken up' নিবন্ধটি পড়িলেই তাহা পরিষ্কার হইয়া যাইবে। নিবন্ধটিতে লেখক চীন সরকারকে একটি ভয়াবহ প্রস্তাব দিয়াছে। সেটি হইল, 'চীনের উচিৎ পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল এবং ভূটানের মত কয়েকটি বন্ধুরাষ্ট্রের সাহায্যে ভারতকে ২০-৩০টি স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত করা।' এইকাজে নির্দিষ্টভাবে কয়েকটি অপকর্মের নির্দেশও দিয়াছেন লেখক। যেমন, চীনের উচিৎ ভারতের কয়েকটি রাজ্যের ধর্মীয় ও আঞ্চলিক গোষ্ঠীগুলিকে ক্রমাগত উস্কানি দেওয়া যাতে তারা ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এলক্ষ্যে তাহার আসামের বিচ্ছিন্নতাবাদী আলফা, বড়ো প্রভৃতি গোষ্ঠী, কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীদের ইন্ধন দেওয়া শুরুও করিয়াছে।

চীন সরকার কিন্তু এ ওয়েবসাইটকে নিষিদ্ধ তো নয়ই, এমনকী নিন্দাও করে নাই বরং এই পলিসি অনুযায়ীই ভারতকে চারদিকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। ভারতের অভ্যন্তরে বিশেষ করিয়া উত্তর পূর্বাঞ্চলে অস্থিরতা সৃষ্টি করা তাহার এই পরিকল্পনার অঙ্গ। এই কাজে সে ভারতের প্রতিবেশী বাংলাদেশ ও মায়ানমারকে কাজে লাগাইতেছে। বাছিয়া লইয়াছে উত্তরবঙ্গের 'চিকেন নেক' অঞ্চলকে, যার মাধ্যমেই ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একমাত্র যোগাযোগ। পাকিস্তানের সাহায্যে যেমন তাহাদের বন্দরের উপর আধিপত্য কায়েম করিয়াছে, মায়ানমারের সাহায্যেও তেমনি আন্দামানের নিকটে কোকো দ্বীপে সামরিক ঘাঁটি গড়িয়া তুলিতেছে। ভারতের পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব সীমান্তে সীমানা লঙঘনের ঘটনা ২০০৮ সালে চীন ঘটাইয়াছিল ২৭০টি। এপর্যন্ত সর্বোচ্চ। তবে ২০০৯-এ লোকসভা নির্বাচন থাকায় চীন বুঝিতে পারিতে ছিল না আবার কংগ্রেস ক্ষমতায় আসিতে পারিবে কিনা; তবে ২০০৯ সালে এ পর্যন্ত সীমানা লঙঘনের ঘটনা ঘটিয়াছে মাত্র ৬০টি। তবে চীনা বাহিনীর আগ্রাসী সীমানা টহলের ঘটনা ২০০৮ সালে ঘটিয়াছিল ২২৮৫টি; এই পশ্চিম সীমান্তেই। ২০০৯-এ স্বাভাবিকভাবে এখনও পর্যন্ত ঘটিয়াছে মাত্র ৪১৩টি।

সুতরাং চীন সম্পর্কে জনসচেতনতা গড়িয়া তোলা একান্তই প্রয়োজন। সেইসঙ্গে চীনের বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতিরোধও গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। স্বদেশী গ্রহণ, চীনা পণ্য বর্জন-এর মাধ্যমেই ইহা সম্ভবপর হইবে।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

পূর্বকালীন লোকদিগের আচার ব্যবহার, রীতি-নীতি, ধর্ম, উপাসনা ও বুদ্ধির গতি প্রভৃতি বিষয় সকল মনুষ্যের অবশ্য জ্ঞেয় ইহা বোধহয় সকলেই অঙ্গীকার করিয়া থাকেন।...বেদ, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস সাহিত্যাদি শাস্ত্রের অনুশীলন ব্যাতিরেকে পূর্বকালীন ভারতবর্ষীয়দিগের আচার-ব্যবহারাদি পরিজ্ঞানের আর কোনও পথ নাই।...এই সমস্ত সংস্কৃত ভাষা অনুশীলন সাপেক্ষ।...সংস্কৃত ভাষানুশীলনের এক অতি প্রধান ফল এই যে, ইদানীন্তনকালে ভারতবর্ষে হিন্দী, বাংলা প্রভৃতি ভাষায় কথোপকথন ও লৌকিক ব্যবহারে প্রচলিত আছে ভুরি ভুরি পরিমাণে সংস্কৃত কথা। যাহা ওই সকল ভাষায় সন্নিবেশিত না করিলে তাহাদিগের সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করা যাইবে না। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় সম্পূর্ণ ব্যুৎপত্তি লাভ ব্যতিরেকে তৎসম্পাদন কোনক্রমেই সম্ভাবিত নহে।

—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব

বার্লিন প্রাচীরের পতন এবং ইতিহাসের বিবর্তন

জয় দুবাসী

বিশ বছর আগে ১৯৮৯ সালের ৯ নভেম্বর ইউরোপে একটি দেওয়াল ধসে পড়েছিল এবং এই ঘটনা একটি ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। কমিউনিস্ট নামক দানবদের দ্বারা গড়ে তোলা এক সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল সেদিন। এটা ছিল একটি দুনিয়া কাঁপানো ঘটনা যার প্রভাব সারা পৃথিবীতে আজও সমানভাবে অনুভূত হচ্ছে। পুরো ঘটনার শুরুই হয়েছিল একটি মাত্র ইঁটের অপসারণ দিয়ে যা দেওয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছিল ইউরোপ ও স্বাধীনতার মধ্যিখানে।

আমি যে দেওয়ালটির কথা বলছিলাম আসলে তা ছিল "বার্লিন ওয়াল", যেটি ওইদিন ভেঙ্গে পড়েছিল। আমি অবশ্য আরও অনেক মানসিক ইটের কথাও বলতে চাই যে সমস্ত ইট কমিউনিস্টরা বিশ্বের আনাচে কানাচে গেঁথে রেখেছে নিজেদের সাম্রাজ্য রক্ষার স্বার্থে। এই দেওয়ালের পতনের সাথে সাথে পতন হল ৭২ বছরের পুরাতন এক পোকায় কাটা বিপ্লবের, যার নাম ভাঁড়িয়ে 'কামিয়েনিস'-রা এতদিন সারা বিশ্বকে দাবিয়েছে এবং কিছুটা সফলও হয়েছে।

আর একটি ঘটনাও সেদিন ইতিহাসকে নাড়া দিয়েছিল। বার্লিনে যখন দেওয়াল ধসে পড়ছিল, ঠিক সেই সময় অযোধ্যায় মন্দির গড়ে তোলার তোড়জোড় চলছিল। ঠিক তখনই সেই মুহূর্তে সেইদিনই পাঁচ হাজার মাইল দূরে ইউরোপে কমিউনিস্ট-মন্দির ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছিল। এটা যদি একটি ঐতিহাসিক যবনিকাপাত না হয়, তবে সেটা কি আমি জানি না।

প্রকৃতপক্ষে এটি একটি সমাপতন ছিল না, একটি নয়া ইতিহাস গড়ে উঠছিল, কারণ ইতিহাসের একটি নিজস্ব পথ আছে সঠিক-বেঠিকের নির্ণয়ের এবং সমগ্র ঐতিহাসিক স্থাপত্যের ভারসাম্য রক্ষার। 'বার্লিন ওয়াল' ভেঙ্গে পড়েছিল। কারণ এটি ছিল বিকৃত এবং সংকীর্ণ মনোভাবের ফসল। অযোধ্যা মন্দির গড়ে উঠেছিল কারণ এটা ছিল সঠিক জায়গায় সঠিক মন্দির; শ্রীরামের মন্দির অযোধ্যা ছাড়া আর কোথায়ই বা হতে পারে, যেটা তার পুণ্য জন্মভূমি।' যা ঘটেছে তার দ্বারা একটা অন্যায়কে ন্যায়ে পরিণত করা হয়েছে; এটা ইতিহাস করেছে এবং এটাই তার মুখ্য কাজ ঐতিহাসিক ভবিতব্য।

'বার্লিন ওয়াল' ভেঙ্গে পড়ার কয়েক মাস আগে আমি ওখানে ছিলাম। আমি ওখানে গিয়াছিলাম মূলত পর্যটক হিসাবে এবং একজন ইতিহাসের ছাত্র হিসাবেও। আমি জানতে চেয়েছিলাম ইতিহাসের সঙ্গী হতে কেমন লাগে, বস্তুত ইতিহাস হতেই কেমন লাগে। আমার জোরালো সন্দেহ ছিল আগে থেকেই যে বার্লিন ওয়াল একদিন না একদিন ভেঙ্গে পড়বেই; এটাই তার ভাগ্যের লিখন। এটা আমার জীবদ্দশাতেই সত্য হওয়ায় ভাল লাগছে। আমি ফ্র্যাঙ্কফুর্ট থেকে বার্লিন উড়ে গিয়েছিলাম একটি জরা-জীর্ণ প্লেনে চড়ে যেটা নামার আগেই প্রায় ভেঙ্গে পড়ছিল। কিন্তু আমাদের বার্লিনের আপ্যায়নকারী বন্ধুরা আমাদের নিশ্চিন্ত করেছিল এই বলে যে, সেটা বার্লিন ওয়ালের চেয়ে নিরাপদ।

কিন্তু আমি যখন ওয়ালের কাছে পৌঁছাই, সেটা পুরাতন হিটলার চ্যান্সেলারি থেকে খুব একটা দূরে নয়, আমার কেমন যেন মনে হল সব কিছু ঠিকঠাক চলছে না। দেওয়ালটি একটি কুৎসিৎ কাঠামোর মতোই, যা কেবল কমিউনিস্টরাই সহ্য করতে পারে। এটা ছিল ইউরোপের একটি অন্যতম সুন্দর নগরীর মাঝখানে একটি চক্ষু-বিদারক দৃশ্য। আমি দেওয়ালের মাথায় উঠে দাঁড়িয়ে দেখলাম পূর্ব জার্মানীর সৈন্যরা নীচে বেয়োনেট উঁচিয়ে টহল দিচ্ছে, ভাবখানা যেন এখনই ঝাঁপিয়ে পড়বে। একজন সৈন্য আমাদের এতটাই কাছে চলে এসেছিল যে তাকে ছুঁতে পারতাম এবং ছুঁতে যাচ্ছিলামও,

> **"'বার্লিন ওয়াল' ভেঙ্গে পড়েছিল, কারণ এটি ছিল বিকৃত এবং সংকীর্ণ মনোভাবের ফসল। অযোধ্যা মন্দির গড়ে উঠেছিল কারণ এটা ছিল সঠিক জায়গায় সঠিক মন্দির; শ্রীরামের মন্দির অযোধ্যা ছাড়া আর কোথায়ই বা হতে পারে, যেটা তার পুণ্য জন্মভূমি।'"**

ঠিক তখনই সে আমাকে বললো যে তারা ডজন ডজন পূর্ব জার্মানদের গুলি করে মেরেছে। তারা পশ্চিমে বার্লিনে পালিয়ে যাচ্ছিল। নিজের দেশ ছেড়ে অন্য দেশে যাওয়াটা তাদের কাছে অপরাধ। জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের এক অদ্ভুত আইন এই কমিউনিস্টদের; কখনও আপনি তাদের দেশের নাগরিক আবার কখনও নন।

এটা বিশ বছর আগের কথা, এখন সবকিছু বদলে গেছে। কারণ পুরো পূর্ব জার্মানীটাই এখন একক জার্মানীর একটা অঙ্গ হয়ে গেছে। এখন আর দেওয়াল নেই। সুতরাং আপনি পাসপোর্ট-ভিসার ঝামেলা ছাড়াই এখন জার্মানীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারেন। আজ কাস্তে হাতুড়ি চিহ্ন নেই, নেই লাল পতাকা, লেনিনের মরদেহও সমাধিস্থলে খসে পড়ছে। সরকার এখনও ঠিক করে উঠতে পারেনি এটাকে নিয়ে কি করবে। তবে মস্কোর পার্কগুলো এখন স্তালিন ও তাঁর কমরেডদের ভাঙ্গা মূর্তিতে ভরে উঠেছে। তাতে ধুলো, আবর্জনা জমছে। শিশুরাও ওখানে যেতে ভয় পাচ্ছে।

বার্লিন ওয়াল শুধুমাত্র ইট আর পাথরের বস্তু নয়, এটা একটা প্রতীক। বার্লিন ওয়ালের পতন কমিউনিজমের পতন। দুটো সমার্থক। এই ঘটনার মাত্র দু-বছর পর সোভিয়েত ইউনিয়নেরও পতন হয়েছিল। যেন তা বার্লিন ওয়ালের পতনের জন্যই অপেক্ষা করছিল। এমনকী মিখাইল গর্বাচেভও ভাবতে পারেনি যে এত তাড়াতাড়ি সোভিয়েত ইউনিয়নও ভেঙ্গে টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে, ওয়ালের মতোই।

এবার তাকান অযোধ্যার দিকে। আরো অন্ততঃপক্ষে হাজার বছর লেগে যাবে একটা মন্দির হতে। এটা বেদনার যে ভারতে ঘটনা কত ধীরে ধীরে ঘটে। পূর্ব-জার্মানীর মাত্র কয়েক বছর লেগেছিল স্তালিন এ্যান্ড কোম্পানীর অশুভ সাম্রাজ্যকে গুঁড়িয়ে দিতে এবং নতুন করে গণতান্ত্রিক মোড়কে গড়ে তুলতে। নতুন রাশিয়াতে যারা গেছেন তাঁরা বলেন যে স্তালিন অ্যান্ড কোম্পানীর সেই দেশ আর নেই। কিছু খারাপ আর কিছু ভালোর মধ্যেও আমাদের নতুন রাশিয়া আগের তুলনায় অনেক ভালো। যদিও এখনও মস্কো শহরেই ভিখারীর দল আশ্রয় নেয় আর তরুণীরা ক্রেমলিনের জানালার নীচেই দেহ বিক্রি করে যা তারা স্তালিনের জীবদ্দশাতেই করত। এসব বাদ দিলে পরিবর্তন ভালোর দিকেই যাচ্ছে। মানুষ এখন সুন্দর পোশাক পরছে, ভাল খাবার খাচ্ছে এবং শিশুরাও স্কুলে যাচ্ছে, সেখানে প্রয়োজনীয় শিক্ষক আছে, পাঠ্যপুস্তকও আছে।

কিন্তু আবারও বলি, অযোধ্যায় কোনও পরিবর্তনই হয়নি। সময় সেখানে থম্‌কে দাঁড়িয়ে আছে। যেমনটা শুধুমাত্র ভারতেই হয়ে থাকে চিরকাল। কেউ একজনও নেই ধাক্কা দেওয়ার জন্য। আমরা হিন্দুরা বড় ভীরু, আমরা প্রত্যেকেই ভাবি অন্য কেউ এসে আমাদের সমস্যা মিটিয়ে দিক। আমার কিছু করার নেই। আমার কোন দায়িত্ব নেই। অযোধ্যা অন্য কারো দায়িত্ব নয়, এটা হিন্দুদের তথা ভারতীয়দের দায়িত্ব। এটা সত্য যে দিল্লীতে রয়েছে আমাদের বিরোধীদের সরকার। একই রকম বিরোধী এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন সরকার রয়েছে উত্তরপ্রদেশেও কিন্তু আমরা তো অনন্তকাল ধরে অপেক্ষা করতে পারি না যে, স্বর্গ থেকে কেউ নেমে এসে আমাদের জন্য মন্দির বানিয়ে দেবে। এখন সময় হয়েছে হিন্দুদের নিজের সমস্যা মেটানোর জন্য অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার অভ্যাস ত্যাগ করার। আমরা যদি আইনী, সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে অযোধ্যায় শ্রীরামের মন্দির বানাতে পারি, তা না হলে কি প্রয়োজন এদেশের কোটি কোটি হিন্দুদের যারা এদেশের মাটিকে নিজের বলে দাবী করে?

হিন্দুদের নিজেদেরই নিজেদের সাহায্য করতে হবে যদি সারা বিশ্বও তাদের বিরুদ্ধে যায়। জার্মানীর জনগণ কি সাহায্য করেনি নিজেরা নিজেদের? বার্লিন ওয়ালের একের পর এক ইট, পাথর ভেঙ্গে পড়েছে যতক্ষণ না ওয়াল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ১৯৮৯ সালের ৯ নভেম্বর। কিন্তু হিন্দুরা আজও প্রতীক্ষা করে আছে কবে হবে তাদের মন্দির।

[ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ORGANISER', নভেম্বর ১৫, ২০০৯-এ প্রকাশিত প্রবন্ধটি অনুবাদ করেছেন নারায়ণ চন্দ্র দে]

ঋষিবাক্য কি ভুল হতে পারে?

ইন্দ্রমোহন উপাধ্যায়

আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় পুরো একটা বছর কারান্তরালে কাটাতে হয়েছিল শ্রীঅরবিন্দকে। ১৯০৯ সালের ৬ মে মুক্তি পাওয়ার ২৪ দিনের মাথায় ৩০ মে উত্তরপাড়ায় 'ধর্ম রক্ষিণী সভা'-র আমন্ত্রণে তিনি প্রথম প্রকাশ্যে ভাষণ দিলেন। আর সেদিনই দেশবাসী তাঁকে সম্পূর্ণ এক নতুন রূপে প্রত্যক্ষ করল—তিনি কবি, সাহিত্যিক, জ্ঞানী, স্বদেশপ্রেমী বিপ্লবী শুধু নন, তিনি মহাপুরুষ, দ্রষ্টা, যোগী, ঋষি, ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ কৃপাধন্য। কারাগারে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন ও তাঁকে প্রায় সঙ্গী হিসাবে প্রাপ্তির কথা জানিয়ে শ্রীঅরবিন্দ উত্তরপাড়া ভাষণে তাঁকে দেওয়া ভগবানের দু'টি আদেশের কথা বলেন। একটি হলো, জেল থেকে বেরিয়ে তাঁকে জাতির উত্থানের জন্য কাজ করতে হবে। দ্বিতীয়টি হলো, হিন্দু ধর্মই সনাতন ধর্ম, চিরন্তন ধর্ম, সমগ্র মানব জাতির ধর্ম, এই ধর্মকে দ্বিধাহীন চিত্তে পুনরুজ্জীবিত করার কাজে তাঁকে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

এরকম আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের জন্য ঐতিহাসিক গুরুত্ব পেয়েছে শ্রীঅরবিন্দের উত্তরপাড়া অভিভাষণ। তাই অত্যন্ত মর্যাদা সহকারে পালিত হয়েছে সেই ভাষণের শতবর্ষ পূর্তিও। উত্তরপাড়ার পর মাস খানেকেরও কম ব্যবধানে 'বারাণসী সমতুল' গঙ্গার পশ্চিমকূলেই আরও একটি ভাষণ দেন শ্রীঅরবিন্দ। বিষয়-গুরুত্বে হাওড়া টাউন হলে ২৭ জুনের এই ভাষণও ঐতিহাসিক এবং এখনও, এই পরিবর্তিত সামাজিক ও শাসনতান্ত্রিক পরিবেশেও, অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ওই সময়ে বিভিন্ন স্থানে শ্রীঅরবিন্দ যে-সব ভাষণ দিয়েছিলেন তার মধ্যে মাত্র তিনটি পরবর্তীকালে স্বহস্তে পরিমার্জন করে তিনি প্রকাশ করেছিলেন, টাউন হলের ভাষণ তার একটি।

ধন্যবাদ হাওড়াবাসীদের, তাঁরা একটি সার্বজনিক কমিটি গড়ে অত্যন্ত সুন্দরভাবে এবং মর্যাদার সঙ্গে এই ভাষণের শতবর্ষ পালন করেছেন। হাওড়ায় বাগনান, আন্দুল, শিবপুর, লিলুয়া ইত্যাদি জায়গায় শ্রীঅরবিন্দ-ভক্তদের বেশ কয়েকটি সক্রিয় কেন্দ্র আছে। শতবর্ষ উদ্‌যাপনের যাবতীয় আয়োজনে স্বভাবত তাদেরই প্রধান ভূমিকা ছিল। ২৭ জুন বিকালে হাওড়া ময়দানে শ্রীঅরবিন্দের মূর্তির পাদদেশ থেকে পদযাত্রা টাউন হল প্রাঙ্গণে গিয়ে সেখানে বক্তৃতার 'শতবার্ষিকী স্মারক ফলক' স্থাপন, তারপর আবার শরৎ সদনে ফিরে দীর্ঘক্ষণ ধরে সভা—সবেতেই উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। দুঃখের বিষয়, যে টাউন হলে বক্তৃতার জন্য এই উৎসব, হাওড়া পুরসভার অবহেলার শিকার হয়ে তা ভগ্নদশায় ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে আছে। যে কারণে শতবর্ষের সভা করতে হল শরৎ সদনে। তবে সেদিনের সভায় দীর্ঘক্ষণ উপস্থিত থেকে হাওড়ার মার্কসবাদী মেয়র মমতা জয়সওয়াল যে সুন্দর বক্তৃতাটি করেছেন, তার সুবাদে পুরসভার কিছুটা দোষ স্খলন হয়েছে সন্দেহ নেই। কলকাতার শ্রীঅরবিন্দ ভবন কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ, ইংরেজি ও বাংলায় পূর্ণাঙ্গ ভাষণটি ও কিছু আনুষঙ্গিক তথ্যসহ একটি শোভন ও সুসম্পাদিত বই তাঁরা এই উপলক্ষে প্রকাশ করেছেন। উৎসব কমিটির ছোট্ট প্রকাশনাটিও সুন্দর।

শ্রীঅরবিন্দের টাউন হল ভাষণের বিষয় ছিল, সমিতি গঠনের অধিকার (The Right of Association)। বিষয়টি তো নয়ই, এমনকী সভায় শ্রীঅরবিন্দের বক্তৃতা করার কথাও পূর্বনির্দিষ্ট ছিল না। এসেছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু গীস্পতি কাব্যতীর্থের আমন্ত্রণে স্বদেশী আন্দোলন কেন্দ্রিক এক রাজনৈতিক সম্মেলনে। কথা ছিল, তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হবে। শ্রীঅরবিন্দ বক্তৃতা করবেন না, করবেন গীস্পতিবাবুই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গীস্পতিবাবু নিজেই শ্রীঅরবিন্দ বলবেন বলে ঘোষণা করে দেন, তবে যে-বিষয়ে গীস্পতিবাবু তাঁকে বলতে বলেছিলেন, তা নিয়ে না বলে শ্রীঅরবিন্দ মার্জনা চেয়ে 'সমিতি গঠনের অধিকার' নিয়েই নিজের বক্তব্য সাজান।

ঋষি অরবিন্দ

ডাঃ হেডগেওয়ার

কেন এরকম একটি বিষয়কে তিনি বেছে নিলেন? বরিশালে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত 'দরিদ্র বান্ধব সমিতি' নামে একটি ছোট প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। সেই সমিতির তরুণরা আপদে-বিপদে, মহামারীতে গরিব মানুষের সাহায্য ও সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়ত। অশ্বিনীকুমার তাঁর নিজের মহৎ গুণগুলি তরুণ ছেলেদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পেরেছিলেন। তিনি তাঁর নিজের ব্রজমোহন কলেজকে এমন একটা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিলেন, যা শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় 'মূলগত শিক্ষা প্রসারের দিক থেকে পৃথিবীর যে কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে আদর্শস্থানীয় ছিল।' সেই কারণে শিক্ষিত মানুষেরা তাঁকে ভালবাসত, অনুসরণ করত। তাঁর সেই সমিতির প্রেরণায় গোটা বাখরগঞ্জ জেলা জুড়ে ক্রমে ছড়িয়ে পড়েছিল 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি' নামে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান। দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য, দেশবাসীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশের জন্য, স্বদেশী-র প্রসারের জন্য এই সব সমিতির তলায় মূলত তরুণেরাই সমবেত হয়েছিলেন। তরুণদের এই সমিতিবদ্ধ হওয়ার প্রবণতাকে ইংরেজরা স্বভাবতই ভাল চোখে দেখেনি, বরং কিছুটা শঙ্কিতই হয়েছিল। তাই একটার পর কেটা সমিতির উপর প্রচণ্ড আঘাত নেমে এসেছিল। নির্বাসিত হতে হয়েছিল অশ্বিনী দত্তসহ বেশ কয়েকজন নেতৃস্থানীয়কে। শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং বরিশালে গিয়ে এসব দেখে ও শুনে এসেছিলেন। টাউন হলের বক্তৃতায় তিনি তাই সমিতি গঠনের অধিকারের সপক্ষে বলতে গিয়ে বরিশালের স্বদেশ বান্ধব সমিতিগুলির উপর এই সব দমন-পীড়নের সবিস্তার উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, 'তাদের (সমিতিগুলির) বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর অভিযোগ আনা হয়েছিল! তাদের (ইংরেজদের) ধারণাতে এই সমিতিগুলি হল বিদ্বেষ ও উগ্রতা প্রসারের মাধ্যম। বিদ্রোহের ও ডাকাতির জন্যই গড়া হয়েছে।' অথচ কারণগুলি 'গ্রহণযোগ্য নয়,...অভিযোগগুলি বারবার মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।' সমিতিগুলিতে শরীরচর্চার সঙ্গে আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে লাঠি চালানো শেখানো হত। আর তাতেই ভূত দেখেছিল পুলিশ। একটা অতি সরলীকৃত ধারণা গড়ে তুলেছিল তারা। সে সম্পর্কেই ব্যঙ্গাত্মকভাবে শ্রীঅরবিন্দ বলেন, 'এখন কেন দেশে এত ডাকাতি হয়? এটা সহজভাবে বোঝা যায়, লাঠি জন্ম দিয়েছে বোমাকে আর বোমা জন্ম দিচ্ছে ডাকাতিকে। লাঠি আছে কাদের? লাঠি আছে সমিতিদের। তাহলে এর থেকেই প্রমাণ হয় কারা ডাকাত। এই সমিতিগুলিই হল ডাকাতদল।'

সমিতি (Association) গঠনের অধিকারকে শ্রীঅরবিন্দ 'স্বাধীনতার প্রতীক ও রক্ষাকবচ এবং যৌথ জীবন বিকাশের উপায়' হিসাবে দেখেছেন। বলেছেন, যে কোনও স্বাধীন দেশের নাগরিকের তিনটি অধিকার অপরিহার্য। সেগুলি হলো ঃ স্বাধীন সাংবাদিকতার অধিকার, স্বাধীনভাবে জনসভা করার অধিকার এবং সমিতির অধিকার। স্বাধীনতা লাভের পর বাষট্টি বছর পেরিয়ে আজও কি আমরা শ্রীঅরবিন্দ নির্দিষ্ট এই তিন অধিকার পুরো অর্জন করতে পেরেছি? উত্তর স্বভাবতই 'না'। এরমধ্যে সমিতিকেই শ্রীঅরবিন্দ মানবজাতির সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান বলেছেন। অভিন্ন আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভিন্ন ভাব, অভিন্ন উদ্যম ও কর্মের অভিন্ন ইচ্ছা—এসব মানুষকে সম্পর্কের বাঁধনে বেঁধে দেয়। এই সব থেকে এমন এক শক্তির উদ্ভব হয় যা যৌথ ও সংঘবদ্ধ কর্মধারার মাধ্যমে মানুষকে অভিন্ন উদ্দেশ্যের অভিমুখী করে তোলে। এতে মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় হয়, শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং যে আদর্শের অবলম্বনে এই সম্মিলন তা বাস্তব রূপ পেতে শুরু করে। গতকাল যা ছিল কেবল আদর্শগত তত্ত্ব, যা ছিল বক্তার ছুঁড়ে দেওয়া কিছু কথা, তা ব্যবহারিক রাজনীতির বিষয় হয়ে ওঠে। সেই কারণেই, মানুষ এই অধিকারগুলিকে এত গুরুত্ব দেয়, মূল্যবান সম্পদরূপে এগুলিকে রক্ষা করতে চায়, সহজে বিসর্জন দেয় না।

দেখে-শুনে

প্রাচীনকালে আমাদের এই ভারতবর্ষে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমিতিবদ্ধ হয়ে চলার যে ব্যবস্থা ছিল তা কালক্রমে কীভাবে অবলুপ্ত হয়েছে, বক্তৃতায় সেই প্রসঙ্গও এনেছেন শ্রীঅরবিন্দ। আমাদের গ্রামজীবন এমনই সংগঠিত ছিল যে, সেখানে প্রতিটি মানুষ অনুভব করত তার অস্তিত্বের মূল্য, একই সংঘসত্ত্বার অংশ বলে। আমাদের যৌথ পরিবারের মধ্যেও ছিল সেই সংঘবদ্ধতারই প্রকাশ। শ্রীঅরবিন্দ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, 'আমরা কখনও ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পৃথক সত্ত্বায় পরিণত হওয়ার দিকে ঝুঁকিনি।' তবে যে জিনিসগুলি আমাদের সংঘবদ্ধ জীবনের অঙ্গ ছিল সেগুলিকে আমরা আজ হারিয়ে ফেলেছি। শ্রীঅরবিন্দ ইউরোপীয় প্রভাবকেই এর কারণ বলে মন্তব্য করেছেন। স্বাধীনতা লাভের এতগুলি বছর পরেও সে ঘোর আমাদের কাটেনি, বরং ক্রমে তা আরও চেপে বসছে। পারস্পরিক ভালবাসার সেই ছিন্ন বন্ধনসূত্রকে আজও আমরা পুনরায় গ্রথিত করার প্রয়োজন অনুভব করছি না।

সংঘবদ্ধ তা, সংগঠনই যে শক্তির আধার সে কথাটাকেই শ্রীঅরবিন্দ তাঁর এই টাউন হল ভাষণের মূল উপজীব্য করতে চেয়েছেন। মহৎ কোনও লক্ষ্য যদি সামনে থাকে, তাহলে তা অর্জনে সংঘবদ্ধ হওয়া ছাড়া পথ নেই। যৌথ পরিবার সংগঠিত গ্রামজীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে এক সময় আমাদের সমাজ দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল। সেই সময় চালিত করার মতো কোনও আদর্শ ও শক্তিশালী আবেগের অভাবে আমরা বিদেশী শাসককুলের জীবনচর্যাকে পাথেয় করে সমিতিবদ্ধ হতে চেয়েছিলাম। ঊনবিংশ শতাব্দির গোড়ায় সমিতি বলতে যা ছিল তা শাসকবর্গের দাক্ষিণ্যপুষ্ট, কালে তা এমন এক আন্দোলনের রূপ নিল, শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, যার 'পরিকল্পনা কোনও মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত নয়, নয় কোনও দ্রষ্টার দূরদৃষ্টি সঞ্জাতও। এ এসেছে নিজে থেকেই, বন্যা যেমন আসে, যেমন আসে ঝড়, তেমন করেই।' আর 'স্বদেশ-আত্মার' সে জাগরণ ঘটেছিল মূলত যুব সমাজের মধ্যে, উদীয়মান প্রজন্মের মধ্যে। 'মাতৃভূমি'র জন্য সমিতিবদ্ধ হওয়ার সেদিনের সেই আবেগই তো শেষ পর্যন্ত স্বাধীন ভারতের সূর্যোদয়কে সম্ভব করে তুলেছিল।

শ্রীঅরবিন্দ সেদিন তাঁর ভাষণে যে সমিতির কথা বলেছিলেন তাঁর কেন্দ্রে রেখেছিলেন 'মাতৃভূমি'-কে তাঁর নিজের ভাষায়, 'এটা হলো একটা নির্দিষ্ট জায়গা যেখানে তোমরা সকলে তোমাদের নিজের মায়ের সাক্ষাৎ পেতে পার। এ শুধুমাত্র মাটি নয়। এ শুধুমাত্র ভূমিখণ্ড নয়, এ হল প্রাণবন্ত এক সত্তা। ইনি হলেন সেই মা, যার মধ্যে তোমরা সকলে ঘোরাফেরা করছ এবং তোমাদের সত্তা রয়েছে সেখানে, তোমরা জাতির মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব কর; তোমার ভাইয়ের মধ্যে তুমি ঈশ্বরকে অনুভব কর, বহু বিস্তৃত মানব সমিতির মধ্যে তুমি ঈশ্বরকে অনুভব কর।' আসলে এই বোধ নিয়ে সংগঠনব্রতী হলে সমাজে আপনা থেকেই ভ্রাতৃভাবের জন্ম হয়। তখন এ মিলনে ইউরোপীয়দের মতো ব্যক্তিগত স্বার্থ কাজ করবে না, 'এক ভারতীয় জাতি' হিসাবে আমরা মিলিত হব 'একই দেশের জন্য ভালবাসার দ্বারা,— ভ্রাতৃত্ববোধের আদর্শের দ্বারা,...সেই অনুভূতির দ্বারা যে, আমরা সেই একই মায়ের সন্তান যিনি একই সঙ্গে সমগ্র মানবতার মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ', যেন আমরা সকলে 'ভাই ভাই এক ঠাঁই' অর্থাৎ ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের বন্ধন অবিচ্ছেদ্য।

তাই শ্রীঅরবিন্দ কল্পিত এই সমিতি এমন একটা কিছু নয় যে, সভাপতি, সহ-সভাপতি, বা কোনও সম্পাদক না থাকলে তা অচল হয়ে পড়বে। এমন নয় যে, সদস্যদের মিলিত হওয়ার একটা নির্দিষ্ট স্থান না থাকলে হবে না! অর্থাৎ পদাধিকারী বা মিলনস্থলের অপরিহার্যতাকে তিনি আমল দিতে চাননি। তাঁর কথায়, 'সমিতি এমন একটা জিনিস যা আমাদের ভিতরকার অনুভূতি ও শক্তির উপর নির্ভর করে। সমিতির অর্থ ঐক্য, সমিতির অর্থ ভ্রাতৃত্ব, সমিতির অর্থ একই কাজে একত্রে দৃঢ় বন্ধন। যেখানে আছে চেতনা, যেখানে আছে আত্মোৎসর্গ, আছে নিরপেক্ষতা ও নিঃস্বার্থ কঠোর পরিশ্রম। সেখানে কোন কাজ থেমে থাকবে না। এমন কি সেখানে যদি একজন লোকও থাকে, সে সব রকমের ঝুঁকি নিয়ে কাজটি চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর, কাজটি থেমে থাকবে না।'

সর্বব্যাপী মানব সমাজের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের অনুভূতি নিয়ে সমিতিবদ্ধ হওয়া বা সঙঘশক্তি গড়ে তোলাই যে 'কলিযুগের ধর্ম', শ্রীঅরবিন্দ সে কথাই এই ভাষণে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, 'ভালো বাসো ও সেবা কর তোমার ভাইদের, ভালোবাস ও সেবা কর তোমার মাকে'।

তিনি চেয়েছিলেন, মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের চেতনার প্রভাব শুধু বাংলার নয়, ভারতের সমস্ত নেতার মধ্যে সঞ্চারিত হোক। আর তখন এই জাতি হয়ে উঠবে এক মহান 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি'। এটাকেই তিনি চিরকালীন আদর্শ বলে চিহ্নিত করেছিলেন। সেই সঙ্গে নিশ্চিত আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, 'এরই শক্তিতে আমাদের জাতি ক্রমশ উপরে উঠবে।' কেননা, 'ভগবানের আদেশ নেমে এসেছে এই ভারতীয় জাতির উপরে।' কী সেই আদেশ? তা জানিয়েই শ্রীঅরবিন্দ তাঁর হাওড়া টাউন হলের ঐতিহাসিক ভাষণের ইতি টেনেছিলেন— 'তোমরা মিলিত হও, মুক্ত হও, এক হও, মহান হও।'

সংগঠন ছাড়া, সঙঘশক্তি ছাড়া জাতির পুনরভ্যুদয় ও মাতৃভূমির মহিমান্বিত রূপের পুনঃপ্রকাশ অসম্ভব বলে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর হাওড়া টাউন হলের ভাষণে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিলেন ১৯০৯ সালে। আর তার ১৬ বছর পরে আসমুদ্রহিমাচল সংঘবদ্ধ এক ভারতদেহ গড়ে তোলার সুস্পষ্ট স্বপ্ন নিয়ে নাগপুরে একটি সংগঠনের জন্ম দিলেন এক সমাজ-চিকিৎসক। হয়ত বা শ্রীঅরবিন্দের ভাবনা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের মন ছুঁয়েছিল। আর সেই কারণেই তাঁর সংগঠনের পরিধি আজ সর্বব্যাপ্ত। ঋষি-বাক্য কি ভুল হতে পারে?

রাজ্য রাজনীতি

নিশাকর সোম

রাজ্যে অবলুপ্তির পথে জাতীয় কংগ্রেস

রাজ্য-রাজনীতিতে নানান দলের নানান ঘটনা ঘটছে। সিপিএম-এর অবস্থা এখন ল্যাজে-গোবরে। নেতারা নিজেদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে "মমতা মুখ্যমন্ত্রী" হচ্ছেন এটা সরবে—সগর্বে বলছেন মন্ত্রী গৌতম দেব এবং আবদুর রেজ্জাক মোল্লা। এদিকে বুদ্ধ বাবুকে নিয়ে বিরক্ত হয়ে পড়েছেন কিছু নেতা—এ যেন বেতাল পঞ্চ বিংশতি'র তাল-বেতালকে ঘাড়ে নিয়ে ঘোরা। সিপিএম-এর 'তৃণমূলীরা' মনে মনে বুদ্ধ-বিমান-নিরুপম-শ্যামল এবং বিনয় কোঙার-এর অপসারণ চাইছেন। এই কর্মীদের বক্তব্য ওই নেতাদের সামনে রেখে পার্টিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। বিমান বসু তো স্বীকার করেছেন—"কর্মীদের প্রত্যয় নেই। আমরা ওদের অনুপ্রাণিত করতে পারিনি।" একেবারে নিরেট সত্যকথা। তা'হলে ক্ষমতার তখত তাউস-এ এঁটে বসে থাকা কেন? কোয়াক ডাক্তারদের দ্বারা এ-ব্যাধির নিদান হবে না। আসলে সিপিএম-নেতারা ভাবছেন—২০১১ সালে হেরে গিয়ে সিংহাসন ছাড়বেন।

সিপিএম-কে ঘরে বাইরে সমালোচনা সহ্য করতে হচ্ছে। সিপিআই-এর জাতীয় পরিষদের সভার পর সিপিআই-এর সাধারণ সম্পাদক এ বি বর্ধন বলেছেন, সিপিএম-এর ব্যর্থ পরিচালনা, চটজলদি একক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সর্বোপরি 'দাদাগিরি'-র জন্য বামফ্রন্টের এই অবস্থা। তিনি আরও বলেন, এই বিপর্যয়ের সমস্ত দায়-দায়িত্ব সিপিএম-এর। সিপিএম-এর নীতি এবং নেতাদের পরিবর্তন না হলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট পরাজিত হবে। বর্ধন-এর কথার সংক্ষিপ্তসার হলো—"আইদার ইউ মেন্ড অর এন্ড।" সংশোধন কর নতুবা শেষ হও। বামফ্রন্টের আর এক শরিক ফরওয়ার্ড ব্লকের মুখপত্রে নির্বাচনের ফলের জন্য সিপিএম দলকে দায়ী করা হয়েছে। বামফ্রন্টের সভায় বর্ষীয়ান ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা অশোক ঘোষ বলেছেন—উপনির্বাচনে আমরা জিতে বামফ্রন্টের মান-ইজ্জত বাড়িয়েছি। আর এস পি'র দলীয় পত্রিকাতেও সেই সুর। বিশেষ করে বামফ্রন্ট বাদ দিয়ে সিপিএম-এর একক বামফ্রন্ট। ছোট শরিকদের এক পার্টি—সোস্যালিস্ট পার্টি, বামফ্রন্টের সদ্য সমাপ্ত সভায় উপস্থিত না থেকে তার ইঙ্গিত জানিয়ে দিয়েছে। যে-কোনও বিষয় বামফ্রন্টেই প্রথম আলোচনা হবে। অবশ্য বামফ্রন্টে সিদ্ধান্ত হলে তারপর বাম-নেতা-মন্ত্রীরা প্রকাশ্যে মুখ খুলবেন। বামফ্রন্টের এক নেতার কথায়, বামফ্রন্টকে গঙ্গাযাত্রা করিয়ে দিয়ে এখন আঁটঘাট বাঁধা হচ্ছে। সিপিএমের কিছু নেতা এবং অধিকাংশ কর্মীরা মনে করেন লোকসভা নির্বাচন, তার প্রেক্ষাপট ও নন্দীগ্রাম, এবং পঞ্চায়েত থেকে বিধানসভার উপনির্বাচন পর্যন্ত সমস্ত পরাজয় নিয়ে নিচ থেকে সম্মেলন মারফৎ আলোচনা করা হোক এবং নতুন নীতি-নেতৃত্ব আসুক। তাঁদের স্লোগান বুড্ঢা হাটাও—নবীনদের আনো।

সিপিএম-নেতাদের অবস্থা খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে গুরুগম্ভীর বুকনি ছোটানো। তাতে চিঁড়ে ভিজবে না, যতদিন না-এরাজ্যের সিপিএম-নেতাদের পরিবর্তন হচ্ছে। ততদিনে পার্টির উঠে দাঁড়ানো কষ্টসাধ্য। 'অমিয় সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভৈল।'

বামফ্রন্ট সম্বন্ধে বলা যায় মুখে বামফ্রন্ট-কে শক্তিশালী করার আওয়াজ দিয়ে নিজেদের পার্টির প্রার্থীদের জন্য যে কোনও গোপন "মউ"তে যাবে। খবর-অনুযায়ী তিনটি পার্টি ইতিমধ্যে এই কাজের প্রস্তুতি সেরে ফেলেছেন। অন্তঃসলিলা বিশাল নদীগর্ভে সিপিএম-নেতৃত্ব যেতে বসেছে।

বিধানসভার উপনির্বাচনে দেখা গেল রাজ্য-কংগ্রেসের সীট কমে গেল। এটাতো লক্ষণ। আসল ব্যাধি হলো, এ-রাজ্যের কংগ্রেস-নেতারা কার্যতঃ তৃণমূল নেত্রী তথা নেতাদের অঙ্গুলি হেলনে চলেন! ২০১১-এর মধ্যে কংগ্রেসের অবলুপ্তি-ঘটানোর ব্যবস্থা চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে। এর শুরু "ছোড়দার" তৃণমূলে যোগ দেওয়া থেকে। সিপিএম-এর দুর্দশার কারণ হলো—তাঁদের নেতাদের সবজান্তা-অভ্রংলেহি মনোভাব। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ দেব বাবু বিজ্ঞানীদের সভায় বলে দিলেন—"অ্যাসট্রোনমি বিজ্ঞান নয়।" সরকারিভাবে ত্রুটি সংশোধন করা হোল। বুদ্ধ বাবু এর আগে অন্ততঃপক্ষে সাতবার উল্টোপাল্টা কথা বলেছিলেন। বিজ্ঞানীদের সভায় যাবার আগে মুখ্যমন্ত্রীর উচিত ছিল হোম-ওয়ার্ক করা। করবেন কেন? তাঁর পূর্বসূরী জ্যোতি বসু মনে করতেন—"আমরা ঠিক বাকি সব ভুল।" বুদ্ধ বাবু তো কিস্টোফার কোডওয়েল (Chistopher Codwal)-এর "স্টাডিজ ইন ডায়িং কালচার অথবা ফারদার স্টাডিজ ইন ডায়িং কালচার" পড়েননি। বুদ্ধ বাবু নিজেকে মহাপণ্ডিত সর্বজ্ঞ, বডি লাঙ্গুয়েজ-এর মাধ্যমে এই মনোভাব প্রকাশ করে থাকেন। স্বয়ং লেনিনও বলেছিলেন সাহিত্য সম্পর্কে ম্যাক্সিম গোর্কী বিশেষজ্ঞ। নিন্দিত রুশ কমিউনিস্ট নেতা নিকিতা সার্গিয়েভ খুশচভ বলেছিলেন—"কমিউনিস্টরা টন টন মাপে ননসেন্স কথা বলেন।" খুশচভ বলেছিলেন—"বুদ্ধিজীবীরা হায়না, তাঁরা বাঘ আসার বার্তা জানায়।" বর্তমানে রাজ্যের কমিউনিস্টদের মধ্যে গভীর অধ্যয়নের কোন ছাপ নেই। একজন নেতা তো নিজেকে বিদ্যাসাগর করে তুলতে ব্যস্ত। তিনি জানেন না বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর ছিলেন। শোনা যায় তিনি তাঁর নিজস্ব এক গুঁয়েমিতেই চলেন। কোন কমরেডকেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন না।

> **এ-রাজ্যের কংগ্রেস নেতারা কার্যতঃ তৃণমূল নেত্রী তথা নেতাদের অঙ্গুলি হেলনে চলেন! ২০১১-এর মধ্যে কংগ্রেসের অবলুপ্তি-ঘটানোর ব্যবস্থা চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে।**

এবার আসা যাক এ-রাজ্যের সবথেকে বিজয়ী দল তৃণমূলের প্রসঙ্গে। সাংসদ কবীর সুমনের কথা অনেকে শুনেছেন। তিনি বলেছেন, "আমার সাংসদ কোটার অর্থ আমি খরচ করতে পারবো না। অরূপ ভদ্র, গৌতম দাস, শোভন চট্টোপাধ্যায় খরচ করবেন!" তৃণমূল নেতা শোভন চট্টোপাধ্যায় কবীর সুমনকে ফোন করে বলেন "আপনি আগে যে-রকম বাড়িতে থাকতেন, সেইরকম এখনও বাড়িতে থাকুন। শুধু সইটা করে দিলেই চলবে।" কবীর সুমনকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি সকল ঘটনা তৃণমূল সুপ্রীমোকে জানিয়েছেন? সুমন বলেন, "তাঁকে কী বলবো? তিনি খালি বলেন, কবে গান শোনাবেন। কবে আমাকে গিটার বাজানো শেখাবেন।" তিনি আরও বলেছেন, "সিপিএম এবং তৃণমূলের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। আমাকে দলদাস করা যাবে না।"

একটি খবরে জানা গেল—রেল-এর চাকরীর প্যানেল নাকি রেলমন্ত্রীর নির্দেশে সামগ্রিকভাবে বাতিল করা হয়েছে। কেন? নতুন প্যানেল তৈরি হবে। কিভাবে? পুরাতন প্যানেলের লোকদের অবস্থান কোথায়?

সিপিএম তথা বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু এখন জোড়াতালি দিয়ে বামঐক্য বজায় রাখার চেষ্টা চালাচ্ছেন। এখন থেকে নির্বাচনী সংক্রান্ত বিষয়ে সিপিএম প্রথমে আর এস পি ও ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে বামফ্রন্ট-এ যাবে। এ-ছাড়া যেকোনও কাজের আগে আর এস পি এবং ফরওয়ার্ড ব্লক-এর একজন করে মন্ত্রীকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে আলোচনা করতে হবে। এইভাবেই মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্যের নিষ্ক্রমণ ঘটবে। সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদক পদে গৌতম দেবকে চাইছেন নিচের তলার কর্মীরা। তাঁরা জানেন না—নেতা বদল তো চাই তার সঙ্গে সর্বনাশা নীতিরও অবসান দরকার।

এতো ডামাডোলের মধ্যেও তৃণমূলের একজন নেতা বিক্রম সরকার—যিনি নিকট অতীতে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি পোর্টকমিশনের-এর প্রধানও ছিলেন, তিনিই সম্প্রতি অন্য একটি দলে যোগ দিয়েছেন। এ-রাজ্যের ভবিষতের লক্ষ্য এই ঘটনা দিয়ে শুরু—শেষ নয়। কারণ যারা, শান্তি, সাধারণের সেবা, উন্নয়ন চান তাদের অবশ্যই এই তৃতীয় শক্তির কথা ভাবতেই হবে।

অ রকম

বর্ধমানের 'বাঞ্ছারাম'

যাঁরা তপন সিনহা পরিচালিত 'বাঞ্ছারামের বাগান' ছবিটা দেখেছেন অথচ 'বাঞ্ছারাম' মনোজ মিত্রকে দেখে হাসেননি—এমন 'রামগরুড়ের ছানা' মার্কা দর্শক ভূ-বিশ্বে কোথাও মিলবে কিনা সন্দেহ। দেহের সবকটা অঙ্গ বিকল হয়ে যাওয়া বাঞ্ছারাম তার আজন্মলালিত বাগান ও সদ্যজাত নাতির টানে শেষবয়সে পূর্ণযৌবন লাভ করে রীতিমতো দৌড়ঝাঁপ করছে—এই দৃশ্য দেখে দর্শক খালি খিলখিলিয়ে হেসেছে আর ভেবেছে এমনটা আবার হয় নাকি?

হবে না কেন? বিলকুল হচ্ছে। বিশ্বাস না হয় তো চলে যান সোজা বর্ধমানে। আলাপ করে আসুন ১০২ বছর বয়সী শিউবলাকা সিং-এর সঙ্গে। ক'দিন আগেও ইনি ছিলেন হাওড়ার ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক হাসপাতালে, ডাঃ পার্থ প্রতিম সেনের তত্ত্বাবধানে। বাঞ্ছারামের ফিরে আসার চাইতে যাঁর কাহিনী কোনও অংশে কম লোমহর্ষক নয়। কিছুদিন আগে শিউবলাকা সিং-এর মূত্রনালীতে (ইউরিনারী ট্রাক্ট) বেশ বড়সড় টিউমার ধরা পড়েছিল। প্রস্রাবের সঙ্গে অনবরত রক্ত বের হতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন শিউবলাকার বাড়ির লোকজন। ডাক্তাররা বিস্তর গবেষণা করার পর মন্তব্য করেছিল—যা বয়েস তাতে সার্জারির কোনও ঝুঁকিই নেওয়া যাবে না। স্রেফ ওষুধ দিয়েই চিকিৎসা চালাতে হবে। তবে বাঁচবার আশা নেই বললেই চলে।

ডাক্তারদের কথা শুনে—'বয়স হয়েছে। কি আর করা যাবে। জীবন যেমন রয়েছে, তেমনি মৃত্যুকেও তো মানতে হবে,' গোছের

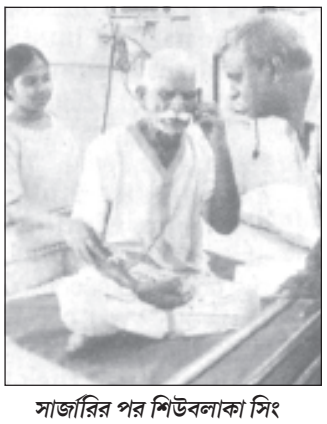

সার্জারির পর শিউবলাকা সিং

ভাবনা মাথায় আসছিল শিউবলাকার বাড়ির পাঁচটি প্রজন্মের। আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিকই শুনছেন। নাতির নাতিকেও দিব্যি স্বজ্ঞানে দেখছেন শিউবলাকা। তিনিই সরাসরি বাড়ির লোকেদের বলে দিলেন—আমার সার্জারি করা হোক। কোনও ভাবনা নেই। কিছু হবে না আমার। সুতরাং এবার আর ডাক্তার নয়, ভগবান-ই ভরসা। তবে এক্ষেত্রে ভগবান উদিত হলেন ডাঃ এ কে দেবের মধ্যে দিয়ে। ডাক্তারবাবু নিজেও যথেষ্ট সন্দিহান ছিলেন এই অতিশয় বৃদ্ধ টির সার্জারির ব্যাপারে। তবে আপাতত হাঁপ ছেড়ে বাঁচার সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ এ কে দেব বিস্ময়ে অভিভূতও হয়ে গেছেন। কারণ শিউবলাকার বাড়ির লোকেরা বলছেন—অপারেশনের পর তিনি প্রতিদিন সকালে এখনও বাজার যাচ্ছেন, চা খাচ্ছেন, খবরের কাগজের পাতা ওল্টাচ্ছেন, মায় চুটিয়ে আড্ডা পর্যন্ত দিচ্ছেন। দুপুরে বাড়ি ফিরে দিব্যি খাচ্ছেন-দাচ্ছেন, আবার বিকেলবেলা সান্ধ্যভ্রমণে বেরোচ্ছেন।

এই প্রসঙ্গে তাঁর সম্বন্ধে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক তথ্য জেনে রাখা প্রয়োজন। ১০২ বছর বয়সে এই সার্জারির পূর্বে শিউবলাকার কখনও সুগার বা রক্তচাপ পরীক্ষার দরকার হয়নি। তাঁর চোখে চশমা নেই। তিনি হাঁটার সময় লাঠি ব্যবহার করেন না। সর্বোপরি কঠোর নিয়মানু-বর্তিতায় নিজেকে আবদ্ধ রাখেন। সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং তথ্য—শিউবলাকা সিং-এর আড্ডার সঙ্গী এখন তাঁরই দুই বাল্যবন্ধু (যাঁরা বহুদিন যাবৎ মৃত)-র পুত্রদ্বয়।

উত্তপ্ত কালিয়াচক

তরুণ পণ্ডিত, মালদা ঃ মালদা জেলার বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির মধ্যে কালিয়াচক বৈষ্ণবনগর, গোলাপগঞ্জ দীর্ঘদিন থেকে দুষ্কৃতীদের স্বর্গরাজ্য। সম্প্রতি কলিয়াচকের মোজমপুর, নারায়ণপুর এলাকায় দুই রাজনৈতিক দলের সংঘর্ষে সাধারণ মানুষদের নাভিশ্বাস উঠেছে। কংগ্রেস নেতা তুহুর আলি বনাম সি পি এম নেতা আসাদুল্লাহ বিশ্বাসের লোকেদের মধ্যে গুলি ও বোমার লড়াইয়ে এ পর্যন্ত ১০-১২ জন মানুষ মারা গেছে। খুন ও পাল্টা খুনে প্রায় প্রতিদিন মোজমপুর ও নারায়ণপুর এলাকা উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। বেআইনী অস্ত্রশস্ত্র জমা করার জন্য পুলিশ প্রশাসন বারবার আবেদন জানালেও প্রচুর পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমা। এখনও এইসব এলাকায় মজুত রয়েছে।

আসলে এইসব সীমান্তবর্তী অঞ্চলে চোরাকারবার ও ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক দলগুলির মদতে দুষ্কৃতীরা সহজেই বেআইনী অস্ত্র তৈরি ও মজুত করার সুযোগ পেয়েছে। মুসলিম জনসংখ্যা বহুল এইসব এলাকাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তেমন কোন অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা নেই, বেশির ভাগ মানুষ বিড়ি ব্যবসার সাথে যুক্ত। ফলে বেআইনী অস্ত্র ব্যবসা, চোরাকারবার, নারীপাচার সহ নানান সমাজবিরোধী কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছে। এর ওপর দেশি মদ ও সাট্টার রমরমা কারবার তো চলছেই।

ফলে গত তিন মাসে এই এলাকাতে ১২ জন খুন হলেও আইন শৃঙ্খলার তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। পুকুর দখল, চোরাচালান ও তোলাবাজি নিয়ে রাজনৈতিক সংঘর্ষে চলছেই। পুলিশের মালদা রেঞ্জের ডি. আই জি. ভগবানরাম মেঘওয়াল, পুলিশ সুপার ভুবন মণ্ডল ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এই এলাকাতে বেশ কয়েকবার এসে শান্তির কথা বললেও তেমন কাজের কাজ কিছু হয়নি। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। ছাত্ররা রাজনৈতিক দলগুলির আক্রমণের শিকার হচ্ছে। জেলাশাসক শ্রীধর কুমার ঘোষ কলিয়াচকের উত্তপ্ত পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার কথা বলেছেন। কিন্তু যেভাবে অর্থ এবং অস্ত্র দিয়ে দুই রাজনৈতিক দল নিজেদের লোকদের মদত জুগিয়ে চলছেন তাতে আগামী দিনে ক্ষমতার রাজনীতি যে হিংসায় পরিণতি হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কুদ্দুস কোথায়, জানতে চাইল গুয়াহাটি হাইকোর্ট

সংবাদদাতা ঃ এবার থেকে সন্দেহভাজন এবং ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালে চিহ্নিত বাংলাদেশীদের ছবি ও হাতের ছাপ ধরে রাখা হবে। এই মর্মে গত অক্টোবর মাসে অসম রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এক নীতি-নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। অতীতে দেখা গিয়েছে ভাষা ও বেশভূষায় মিল থাকার কারণে চিহ্নিত ও নির্দিষ্ট বাংলাদেশীদের আর খুঁজে পাওয়া যায় না। তারা জনারণ্যে হারিয়ে যায়। পুলিশও তাদের খুঁজে বের করে ধরে আনতে পারে না। এই হারিয়ে যাওয়া সুনিশ্চিত বাংলাদেশীদের সংখ্যাটা প্রকৃত বাংলাদেশীদের (অসমে ঢুকে পড়া) এক সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র। হাতের ছাপ ও ছবি ছাড়াও একটি 'আইডেন্টিফিকেশন মার্ক'ও আলাদা করে ধরে রাখার কথাও বলা হয়েছে ওই নির্দেশে।

সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে যে, এতাবৎ বারো হাজার ট্রাইবুনালে চিহ্নিত বাংলাদেশী আদালত থেকে বের হয়ে জনারণ্যে হারিয়ে গিয়েছে। পুলিশের কাছে তাদের ঠিকানাই ছিল। অন্য কিছু ছিল না। পরে পুলিশ তাদেরকে আর খুঁজে পায়নি। এদিকে ওই চিহ্নিত বাংলাদেশীদের ছবি তোলা বা হাতের ছাপ নেওয়ার কোনও আইনগত বৈধ অধিকারও পুলিশের ছিল না। ফলে পুলিশকে ধোঁকা দেওয়াটা বাংলাদেশীদের পক্ষে খুবই সহজ। পুলিশ রুটিনমাফিক প্রদত্ত ঠিকানায় খোঁজ করতে যায় আর ব্যর্থ

বিচারপতি বি কে শর্মা

হয়ে ফিরে আসে।

এরকমভাবে পুলিশকে ফাঁকি দিয়েছে মরিগাঁও-এর আব্দুল কুদ্দুস। গুয়াহাটি হাইকোর্ট কংগ্রেসী রাজ্য সরকারকে চিহ্নিত বাংলাদেশীদের গ্রেপ্তার করতে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিল। কেন না, কুদ্দুসকে আদালত বাংলাদেশী বলেই রায় দিয়েছিল। এদিকে কুদ্দুস পুলিশের নাগাল এড়িয়ে সরে পড়ে। প্রসঙ্গত, এই সরে পড়ার অর্থ অসমেই হারিয়ে যাওয়া। তখন গুয়াহাটি হাইকোর্ট পুনরায় গ্রেপ্তার করতে না পারার জন্য রাজ্য সরকারকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করায়। কেননা, চিহ্নিত বাংলাদেশীকে আইনী কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করতে প্রশাসন ব্যর্থ হয়েছে। মরিগাঁও-এর পুলিশ সুপার স্রেফ বলে দেন— আব্দুল কুদ্দুসকে পাওয়া যাচ্ছে না। তখন গুয়াহাটি হাইকোর্ট চিহ্নিত বাংলাদেশীদের 'হাওয়া হয়ে যাওয়া' আটকাতে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেন।

সূত্র মতে, অবস্থাটা 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে'-এর মতো হয়ে গেল। এতদিনে সবার অগোচরে (হয়তো বা জ্ঞাতসারে) অসমের বাংলাদেশীকরণ-এর পাকা ব্যবস্থা হয়ে গেছে। এই ব্যবস্থা নেওয়াটা অনেক আগেই উচিত ছিল। তিন লক্ষ সন্দেহজনক বাংলাদেশীর মামলা ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন। এদের প্রায় সবাই যে মুসলমান একথা না বললেও চলে। এরপর তো নিত্যনতুন সন্দেহভাজন বাংলাদেশী মামলা ট্রাইবুনালে নথিভুক্ত হচ্ছেই।

রুখে দাঁড়াল পিরকি ওঁরাও

মালদা ঃ জেলার জনজাতি অধ্যুষিত পুরাতন মালদা, হবিবপুর, গাজোল প্রভৃতি ব্লকে এবং চাঁচলের কিছু এলাকাতে সাধারণ জনজাতি মানুষরা এখনও অবহেলিত ও দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করছেন। সাঁওতাল সম্প্রদায়ভুক্ত এইসব মানুষরা এখনও নিজেদের তৈরি মদ ও দেশি মদের নেশায় এখনও ঢুকে থাকেন। খ্রীস্টান মিশনারীরা দারিদ্র্যের সুযোগে ধর্মান্তরকরণের সুযোগ পাচ্ছে। তবে আশার কথা যুবক ও যুবতীদের মধ্যে পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ সম্প্রতি বেড়েছে। তাছাড়া খেলাধূলার প্রতিও তারা নজর দিয়েছে। বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের উদ্যোগে আয়োজিত ক্রীড়ানুষ্ঠানে তাদের উপস্থিতি ও উৎসাহ চোখে পড়ার মত। কিন্তু তাদের সহজ সরলতার সুযোগ নিচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলি। কে এল ও, মাওবাদী সন্দেহে পুলিশ কয়েকজনকে হবিবপুর থেকে তুলে নিয়ে গেছে যারা প্রত্যেকেই নির্দোষ। সম্প্রতি পিছিয়ে পড়া জনজাতি শিক্ষিতা এক মহিলার সাহস ও উদ্যোগে শেষ পর্যন্ত আর এক জনজাতি নাবালিকার ধর্ষণকারীদের শাস্তির জন্য আবেদন গৃহীত হল চাঁচল থানাতে। ঘটনাটি ঘটে ৩০ সেপ্টেম্বর। চাঁচল থানার অন্তর্গত জিতারপুর খুরটোলা গ্রামের অর্চনা ওঁরা। ওকে তিনজন মিলে ধর্ষণ করে ও মেরে ফেলার চেষ্টা করে। সেই সময় একজন মহিলা দেখে ফেলায় ধর্ষণকারীরা পালিয়ে যায়। দুষ্কৃতীরা দরিদ্র পরিবারের অর্চনার বাবাকে ঘটনাটি পুলিশকে না জানানোর জন্য হুমকি দেয়। ধর্ষণকারীরা গ্রামে ঘুরে বেড়ালেও সাধারণ মানুষ এর কোন প্রতিবাদ করেনি। ওই গ্রামেরই, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী পিরকি ওঁরাও বাড়িতে এসে ঘটনাটি শুনে সোজা অর্চনাকে নিয়ে চাঁচল থানাতে হাজির হন এবং ধর্ষণকারীদের বিরুদ্ধে এফ. আই আর করেন। চাঁচল থানা অর্চনার মুখে সমস্ত কথা শুনে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন একজন ধর্ষণকারী গ্রেপ্তার করেন।

আগে এরকম ঘটনা ঘটলেও কেউ থানাতেও এসে অভিযোগ জানানোর সাহস পায়নি। পিরকি ওঁরাও জনজাতি সমাজে শিক্ষিতা হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন—এটাই আশার কথা।

অর্থ বরাদ্দ সত্ত্বেও পুলিশের আধুনিকীকরণে ব্যর্থ অসম সরকার

সংবাদদাতা ঃ অসমে আইনশৃঙ্খলা সম্বন্ধে যত কম বল যায় ততই ভালো। কেন্দ্র সরকার পুলিশের আধুনিকীকরণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করলে রাজ্য তা ব্যবহারই করে উঠতে পারে না। রাজ্য পুলিশ দিবসে মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ সহ ডিজিপি শংকর বরুয়া তথা প্রশাসনের সংশ্লিষ্টরা সবাই পুলিশি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের ওপর সবচাইতে বেশি গুরুত্ব প্রদান করেছেন। কিন্তু কেউ খেয়াল রেখেছেন কি, গত বছর অসম সরকারকে পুলিশ আধুনিকীকরণ বাবদ কেন্দ্রের তরফে দেওয়া ৬৮ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকার কী হলো? না, অন্যান্য কেন্দ্রীয় প্রকল্পের মতোই কেন্দ্রের দেওয়া এই টাকারও সদ্ব্যবহার করতে পারেনি তরুণ গগৈ-এর নেতৃত্বাধীন অসম সরকার। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রবিভাগের এক শীর্ষ সূত্র এই কথা জানিয়ে বলেছেন, 'গত বছর অসম সহ মোট এগারোটি রাজ্যকে ১,১৫৮ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল পুলিশ—আধুনিকীকরণ খাতে। কিন্তু অধিকাংশ রাজ্যই নিজেদের অংশের টাকাটা পুরোপুরি খরচ করতে পারেনি।' সূত্রমতে আরও জানাচ্ছে যে অসম সহ ওড়িশা এবং ছত্তিশগড় সরকার এখনও পর্যন্ত কোন ধরনের ব্যবহারিক প্রমাণপত্রও কেন্দ্রকে দাখিল করেনি। সন্দেহ করা হচ্ছে এই তিন রাজ্য পুলিশ আধুনিকীকরণের কেন্দ্রীয় তহবিলের বিন্দুমাত্র সদ্ব্যবহার করতে পারেনি। এমন অবস্থায় ফের পুলিশ আধুনিকীকরণ বাবদ অসম কেন্দ্রীয় তহবিল লাভে যে অসমর্থ হবে তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সূত্রটি এই মন্তব্য করে জানিয়েছে, 'ব্যবহারিক প্রমাণপত্র হাতে না এলে রাজ্যগুলোকে পরবর্তী সাহায্য দেওয়ার ক্ষেত্রে নিয়মগত বাধা আছে।' উল্লেখযোগ্য যে ওই বৃহৎ পরিমাণ তহবিলের সিংহভাগই গেছে সাতটি নকশাল অধ্যুষিত রাজ্যে। এছাড়াও গেছে চারটি সন্ত্রাস জর্জরিত রাজ্যে। আর এই চারটি রাজ্যের মধ্যে অসমকেও চিহ্নিত করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। নকশাল অধ্যুষিত রাজ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, ছত্তিশগড়, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিমবঙ্গ। সন্ত্রাস জর্জরিত রাজ্য হিসেবে অসম ছাড়া রয়েছে কাশ্মীর, মণিপুর এবং নাগাল্যান্ড। অর্থাৎ সন্ত্রাস জর্জরিত চারটি রাজ্যের মধ্যে তিনটিই হচ্ছে উত্তর-পূর্বাঞ্চল অন্তর্ভুক্ত রাজ্য।

বলা হচ্ছে, পুলিশি আধুনিকীকরণের ওপর কেন্দ্রীয় সরকার গত দুই-তিন বছর ধরে গুরুত্ব দিয়ে আসছে। কিন্তু, রাজ্যগুলি এক্ষেত্রে প্রচণ্ড উদাসীনতা দেখাচ্ছে। অন্যান্য রাজ্যের কথা বাদ দেওয়া হলেও সন্ত্রাস জর্জরিত রাজ্যগুলিও এক্ষেত্রে কোনওধরনের আন্তরিকতা না-দেখানোটা অত্যন্ত বিস্ময়কর। উল্লেখযোগ্য যে, নকশাল অধ্যুষিত রাজ্যগুলোকে পুলিশি আধুনিকীকরণ বাবদ দেওয়া হয়েছে মোট ৩৭২ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা। আর সন্ত্রাস জর্জরিত রাজ্যগুলিকে দেওয়া হয়েছে ২৫৫ কোটি ৪২ কোটি টাকা। সব চাইতে বেশি টাকা পেয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর। ১০৯.৬৫ কোটি। সন্ত্রাস জর্জরিত রাজ্য হিসাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্য দুই রাজ্য নাগাল্যান্ড এবং মণিপুরকে দেওয়া হয়েছে যথাক্রমে ৩৮.৪২ এবং ৩৯.২৩ কোটি টাকা।

গোপাষ্টমী মেলা

গত ২৬ অক্টোবর, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর লোকাল থানার অন্তর্গত গোপালী আশ্রমে মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয় গোপাষ্টমী মেলা। এই অনুষ্ঠানে আশ্রমের স্থায়ী ছাবিবশটি গোমাতাকে পাঁচশোরও অধিক ধার্মিক ব্যক্তিরা 'গো-গ্রাস' দান করেন এবং সাধ্যমত গো-গ্রাসের জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন। গো-পূজনসহ সত্যনারায়ণ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও আশ্রম শুভানুধ্যায়ী রঘুবীর গুপ্তা, অবনীকুমার ভঞ্জ, মনোরঞ্জন কবি, রবীন বণিক, কুশল কুণ্ডু, ডাঃ শচীন কুমার সিংহ প্রমুখ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বহু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্থানীয় খেমাশুলির ভজন মণ্ডলী কর্তৃক আকর্ষণীয় গোপীকামঙ্গল পরিবেশিত হয়। এক কথায় সাফল্যের সঙ্গে অনষ্ঠানটি উদ্‌যাপিত হয়।

আলিপুর বার্তার ৪৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

গত ২৫ অক্টোবর দক্ষিণ ২৪ পরগণার সাখালিতে নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হল সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'আলিপুর বার্তা'র ৪৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস।

"গণতন্ত্র রক্ষার্থে সংবাদপত্রের ভূমিকা ও নাগরিকদের কর্তব্য" শীর্ষক এই আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল, সভার সভাপতি ডঃ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

পত্রিকার ওয়েবসাইট-এর উদ্বোধন করেন অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল। ওয়েবসাইট হল www.alipurbarta.org। এছাড়াও পত্রিকার সম্পাদক অরুণভূষণ গুহ'র উদ্যোগে "পেনফ্রেন্ড ফ্যামিলি" নামে একটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের শুভ সূচনা করা হয়। যার মূল বিষয় হল ২৪ ঘণ্টার জন্য সাধারণের সমস্যা সম্পর্কে অবহিতকরণ এবং সংকট নিরসনের জন্য প্রচেষ্টা করা।

অর্শ চিকিৎসা

গত ১লা নভেম্বর, রবিবার সেবা ভারতীর পরিচালনায় বিষ্ণুপুরে একটি অর্শ চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে বিশিষ্ট অর্শ চিকিৎসক ডাঃ বি সি সাহা, মোট ৪১ জন রুগীর চিকিৎসা করেন।

বাঁকুড়া বিভাগ প্রচারক প্রভাত মণ্ডল শিবির পরিচালনা করেন।

‘লাভ জেহাদ’ ঠেকাতে এককাট্টা কেরল সমাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ জেহাদের নতুন কৌশলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ক্রমশ দানা বাঁধতে শুরু করেছে কেরলে। গত তিন বছরে প্রায় চার হাজার হিন্দু ও খ্রীষ্টান পরিবারের মেয়েরা আচমকাই তাদের বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে। পরে জানা যায় কলেজে পড়া অমুসলমান ওই কিশোরী মেয়েদের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে মুসলিম সম্প্রদায়ের যুবকরা তাদের বিয়ে করছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ওই মুসলমান যুবকরা এমন সব নাম ব্যবহার করছেন যা শুনে প্রাথমিকভাবে তাদের মুসলমান নাও মনে হতে পারে। কিন্তু, বিয়ের পর তাদের স্বরূপ প্রকাশিত হয়। পরিকল্পিতভাবে পরিচয় গোপন করে এই বিয়ে আপাতত ‘লাভ জেহাদ’ নামেই আখ্যায়িত হচ্ছে। এর মাধ্যমে ওই অমুসলিম কিশোরীদের ড্রাগ পাচার ও সন্ত্রাসের কাজে লাগায় ওইসব মুসলমান যুবকরা। বিয়ের পর ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমানে পরিণত হওয়া সেইসব কিশোরীদের পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, নেপাল ও সৌদি আরবে পাচার করেও দেওয়া হয় বলে একটি চাঞ্চ ল্যকর তথ্য সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে।

গত তিন বছর ধরে এই নতুন জেহাদী আতঙ্কের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করে আসছে আর এস এস, ভি এইচ পি এবং এ বি ভি পি-র মতো সামাজিক সংগঠনগুলি। এবার ঘুম ভেঙেছে কেরল ক্যাথলিক বিশপ কাউন্সিলের (কে সি বি সি) কেরলের প্রায় ২৫ শতাংশ খ্রীষ্টান এদের কথা মেনে চলেন। সারা রাজ্য জুড়ে প্রায় হাজার খানেক চার্চকে এই ‘লাভ জেহাদ-এর ওপর কড়া নজর রাখার জন্য ‘সানডে মাস’ শীর্ষক সার্কুলারে বলা হয়েছে। এতে অভিভাবকদের বলা হয়েছে তাদের সন্তানদের ওপর নজরদারি বাড়ানোর জন্য। এমনকী দরকার হলে, তাদের ফোন বা মোবাইল এবং ইন্টারনেট-এ আড়ি পাততেও যেন দ্বিধা না করেন বাবা-মায়েরা—এমনটাই বলা হয়েছে সেই সার্কুলারে। সেইসঙ্গে তাতে রাজ্যের শাসক সিপিএম ও পুলিশের কাছেও আবেদন জানানো হয়েছে যে তাঁরা যেন এনিয়ে তদন্ত করেন ও কেরল সমাজের পক্ষে উদ্বেগজনক এই আতঙ্কটি উৎখাতের জন্য প্রয়োজনীয় সবধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

অন্যদিকে হিন্দু সমাজের জন্যে একনাগাড়ে কাজ করে চলা শ্রী নারায়ণ ধর্ম পরিপালনযোগম্ (এস এন ডি পি)-এর সাধারণ সম্পাদক ভেল্লাপাল্লি নেতিসান বলেছেন, সমগ্র হিন্দু সমাজ ও হিন্দু ইজাভা সম্প্রদায় এই ‘লাভ জেহাদে’ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তাই তাঁদের পক্ষ থেকে জোরালো প্রতিবাদ উঠে আসবেই। তাঁর মন্তব্য—‘এস এন ডি পি-র প্রাপ্ত সংবাদ অনুসারে, বিভিন্ন এলাকা থেকে বহু হিন্দু মেয়ে উধাও হয়ে গেছে এবং রিপোর্ট অনুযায়ী কলেজে যাওয়া মেয়েরাই মুসলিম যুবকদের টার্গেট হয়ে দাঁড়িয়েছে।’ জানা গিয়েছে—আই এস আই-ই এখনও পর্যন্ত ‘লাভ জেহাদে’ পর্যাপ্ত পরিমাণে টাকা যুগিয়ে চলছে। এবং একটি অমুসলমান মেয়ের জন্যে এরা চার লক্ষ টাকা পর্যন্ত খরচ করতেও পিছপা নয়। শ্রী নেতিসান-এর অভিযোগ—“এ ব্যাপারে সরকার উদাসীন। তাদের ভূমিকা সন্তোষজনক নয়।”

প্রতিবাদে খড়্গহস্ত

ভেল্লাপাল্লি নেতিসান

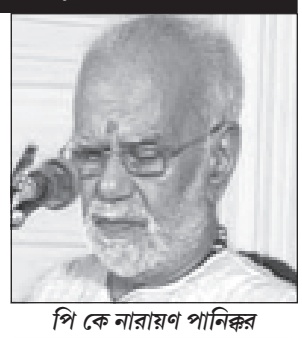

পি কে নারায়ণ পানিক্কর

অন্যদিকে নায়ার সার্ভিস সোসাইটির (এন এস এস) সাধারণ সম্পাদক পি কে নারায়ণ পানিক্কর একে ‘প্রেমের সঙ্গে সন্ত্রাসের মৈত্রী’ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি সিপিএমকে একপ্রকার হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন হয় তারা ওইসব মুসলিম যুবকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিক, নাহলে এন এস এস নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে ‘লাভ জেহাদে’র বিরুদ্ধে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলনে নামবে।

ভারতীয় বিচার কেন্দ্রের ডিরেক্টর পি. পরমেশ্বরণ বলেছেন—“মানবতা, ঐশ্বরিক প্রেম ও ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ‘লাভ জেহাদ’। এর বিরুদ্ধে কে সি বি সি, এন এস এস ও এস এন ডি পি যে অবস্থান নিয়েছে তাতে আমি খুশী।” প্রসঙ্গত, ইতিপূর্বে কেরল হাইকোর্টের কাছে জমা পড়া পুলিশের ডিজি-র রিপোর্টে ‘লাভ জেহাদে’র কোনও উল্লেখ ছিল না। কোর্ট সেই রিপোর্টকে অনির্দিষ্ট এবং বৈপরীত্যে ভরা বলে অভিহিত করেন। বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, এনিয়ে ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগ পূর্বেই এদেশের গোয়েন্দা বিভাগ ও ‘র’-কে সতর্ক করে দিয়েছিল।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন কেরলের আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো-টাই এই ‘লাভ জেহাদে’র জন্যে দায়ী। আরব দেশ ও ইউরোপীয় টাকায় ভেসে গিয়ে হিন্দু ও খ্রীষ্টানরা তাদের মেয়েদের কোটি কোটি টাকা খরচ করে বিবাহের আয়োজন করেন। সেখানকার খ্রীষ্টান ও হিন্দু সমাজে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের সংখ্যা কম। সেই কারণে দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের বিয়ে দেওয়া বেশ কষ্টকর। সেজন্য দরিদ্র খ্রীষ্টান পরিবারের অভিভাবকরা তাদের মেয়েকে ‘নান’ করে চার্চে পাঠিয়ে দেয়। আর এই নিদারুণ দারিদ্র্য থেকে বিয়ের খরচ বাঁচানোর শ্রেষ্ঠ উপায় হলো পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করা। যে সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করছে মুসলিম জেহাদিরা।

চার বছরে প্রভূত উন্নতি বিহারে : আলুওয়ালিয়া

সংবাদদাতা ঃ গত ১৮ই নভেম্বর বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও রাজ্যসভার সদস্য এন কে সিং-এর লেখা ‘দ্য পলিটিক্স অব্ চেঞ্জ’-এর হিন্দী সংস্করণ ‘পরিবর্তন আউর রাজনীতি’ শীর্ষক একটি পুস্তকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পাটনায় এসে কেন্দ্রীয় যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া উন্নয়নের প্রশ্নে দরাজ হস্তে সার্টিফিকেট দিলেন বিহার সরকারকে। মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী সুশীল মোদীকে পাশে নিয়ে মন্টেক বলেন—“গত চার বছরে বিহার সরকার পরিকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রভূত কাজ করেছে।”

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার ও উপমুখ্যমন্ত্রী সুশীল মোদীর সঙ্গে মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া। — ফাইলচিত্র

নীতিশ কুমারের আমলে প্রথমবারের জন্য বিহারে এলেন আলুওয়ালিয়া। এসেই তাঁর বক্তব্য হলো—এবছর বিহারে আর্থিক প্রবৃদ্ধি র পরিমাণ ৮.৯ শতাংশ। এই সাফল্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। তিনি আরও জানান, শুল্ক কাঠামোর বিশেষ পরিবর্তন না করে কেন্দ্রীয় সরকার যে বিশেষ স্কীমে পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলিকে সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার কথা ভাবছে তিনিও তার পক্ষপাতী। আলুওয়ালিয়ার বক্তব্য—“এটা এখন বলার সময় নয় যে কেন্দ্র বিহারকে কি দেবে না দেবে, অথবা বিহারের কতটা প্রয়োজন রয়েছে। এখন নিরন্তর কাজের মাধ্যমে রাজ্যকে প্রতিনিয়ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময়।”

যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান একপ্রকার স্বীকার করেই নেন যে জনসংখ্যার নিরিখে বিহার কখনই কেন্দ্রের কাছ থেকে সেভাবে কিছু অর্থ সাহায্য পেত না। তাঁর মন্তব্য—“বিহারের বর্তমান উন্নয়নকে অব্যাহত রাখতে হলে এবং আরও দ্রুততার সঙ্গে উন্নয়ন করতে গেলে আরও টাকার দরকার। এ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে অবশ্যই আর্থিকভাবে সহযোগিতা করবে। প্রথম ইউপিএ সরকার যা করবে বলেও করতে পারেনি, এবারের ইউপিএ সরকার তা পূরণ করে দেখাবে।”

স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মন্টেক, যার বইয়ের প্রকাশ অনুষ্ঠানে আসা সেই এন কে সিং-এর সঙ্গে দীর্ঘ পঞ্চা শ বছর ধরে তাঁর বন্ধুত্বের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন। নয়-এর দশকে মন্টেক, এন কে সিং এবং বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী ও তৎকালীন অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিংকে একত্রে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী যে ‘সিং পরিবার’ বলে মজা করতেন সেই প্রসঙ্গও উল্লেখ করেন আলুওয়ালিয়া।

মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার প্রথমবার বিহারে আসার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন মন্টেককে। তিনি বলেছেন “আমরা ভাবছিলাম যে আপনি হয়তো কয়েকদিনের মধ্যেই এরাজ্যে আসবেন। একটা রাজ্য সরকার বড়জোর পরিকল্পনা ছকে রাখতে পারে কিন্তু আসল ক্ষমতাটা কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে কেন্দ্রের হাতে। আমি আশা রাখি, কেন্দ্র ও রাজ্যের আলাদা আলাদা কোয়ালিশন সরকার এরাজ্যকে কেন্দ্রের সাহায্য করার ব্যাপারে কোনও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে না। সুতরাং একটা অর্থনৈতিক উন্নয়ন এখানে হবেই।”

তিনি বলেন, বিহার সরকার ইতিমধ্যেই জ্ঞানের বিকাশের ক্ষেত্রে ভর্তুকি দিতে শুরু করেছে। যার মধ্যে অন্যতম পদক্ষেপ দ্বিচক্রী (bicycle) এবং একক ক্রয়ের (uniform purchase) জন্য ছাত্রদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠিয়ে দেওয়া। নীতিশ মনে করছেন “দুর্নীতিগ্রস্ত পিডিএসের মাধ্যমে ভর্তুকি দেওয়ার চাইতে কেন্দ্রের উচিত ভুর্তুকি ব্যবস্থাটাকে যাতে অনেক যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলা যায় তার দিকে নজর দেওয়া।”

নীতিশ এন কে সিং-কে বলেছেন—“আপনি একজন এম পি হিসেবে পুনরায় আপনার রাজনৈতিক মূল স্রোতে ফিরে আসায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আশাকরি, একজন ব্যুরোক্র্যাট হিসেবে এখনও দেশকে আপনি অনেক কিছু দিতে পারবেন।

বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী সুশীল মোদী বলেছেন—“নীতিশ কুমার যে প্রচেষ্টা করছেন তার অন্তিম ফলাফলটুকু দেখার জন্য এন ডি এ সরকারের আরেকবার ক্ষমতায় আসার প্রয়োজন রয়েছে।”

‘অয়ি ভুবন-মনমোহিনী, মা’

সাধনানন্দ মিশ্র।। আলোচ্য ‘মাতৃতন্ত্রের সাধনা ও ভাবনা’ বইটিতে লেখক ডঃ অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ মন্থন করে তাঁর সাধনা ও উপলব্ধির দ্বারা মায়ের বিভিন্ন রূপ বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি মাতৃভাবনাকে প্রধানতঃ তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন। প্রথমটি হচ্ছে, গর্ভধারিনী মা অর্থাৎ যিনি সাধনোচিত মনুষ্যদেহের জন্মদাত্রী। গর্ভধারিণী মা ব্যতীত মানুষ পৃথিবীতে দেহধারণ করতেই পারত না। আর দেহধারণ না হলে সাধনভজন হবে কার মাধ্যমে। কাজেই স্থূলদেহের মাধ্যমে সাধনার জন্যই এই দেহধারণ। সেই দেহকে লালনপালন করা, সংরক্ষণ করা, পরিপুষ্ট করা ও সক্রিয় রাখা গর্ভধারিণী মা বা পালিকা মায়ের কাজ। এজন্য তিনি প্রণম্য। যাঁর কৃপায় মানুষ এই দেহলাভ করেছে, মায়ের স্নেহচ্ছায়ায় পালিত, পুষ্ট রক্ষিত হয়েছে ও হচ্ছে, সেই জীবন্ত মাতা-পিতাকেই প্রত্যক্ষ ঈশ্বরজ্ঞানে ভক্তি ও পূজা করা দরকার। মাতার এই ঋণ কখনই পরিশোধ করা যায় না। একজন মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার জন্মদাত্রী মা বাৎসল্যস্নেহে সদাসর্বদা লক্ষ্য রেখে চলেন। কাজেই জন্মদাত্রী মাতা-পিতা প্রত্যক্ষ দেবতা।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে, দেশমাতৃকা ভারতমাতা। জন্মগ্রহণ করার পর থেকেই গর্ভধারিণী মা যেমন সন্তানকে লালন-পালন করে মানুষ করেন, তেমনই স্বদেশজননী ভারতমাতা তাঁর মাটিতে চলাফেরা, খেলাধূলা করতে দিয়ে ছেলেদের নানাপ্রকার অত্যাচার সহ্য করেন। আবার আলো, বাতাস জল ও মাটিতে উৎপন্ন খাদ্য শস্যাদি দিয়ে তাদের সংরক্ষণ ও পরিপুষ্ট করেন। ‘মাতা ভূমি পুত্রোহহং পৃথিব্যাঃ—ভূমি আমার মাতা, আমি ধরিত্রীমাতার পুত্র। সেই অর্থে যে মাতা তার সমাজ, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে এক রাষ্ট্রদেহ গড়ে তুলেছেন, তিনিই স্বদেশজননী বা রাষ্ট্রমাতা বা ভারতমাতা। হিন্দু শাস্ত্রে বেদ উপনিষদের কাল থেকেই এই ধারণা প্রচলিত রয়েছে। রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলছেন, অপি স্বর্ণময়ী লঙ্কা ন মে লক্ষ্মণ রোচতে/ জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।’ গিরি গোবর্দ্ধন ধারণ করার পূর্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীদের বলেছিলেন, ভারতের নদ-নদী পাহাড় পর্বত-বৃক্ষলতা প্রকৃতির পূজা করা উচিত, দেশমাতাকেই পূজা করতে হয়, ইন্দ্রের পূজা করে কী লাভ? আধুনিক যুগে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র বন্দে মাতরম্ মন্ত্রে ভারতমাতার বন্দনা করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষের স্বদেশভক্তির আদর্শ গ্রহণ করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ার ও তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী গুরুজী গোলওয়ালকর অধ্যাত্মচেতনার সঙ্গে রাষ্ট্রচেতনার সমন্বয়

ঘটিয়ে এক শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ, ত্যাগব্রতে দীক্ষিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ হিন্দুজাতি গঠন করবার পথে জাতিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। মায়ের সুখেই সুখ, মায়ের দুঃখে দুঃখবোধ করা ও মায়ের দুঃখমোচনের জন্য প্রবৃত্ত মাতৃভক্ত ও দেশভক্ত সন্তান ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। এটাই মায়ের প্রতি সুসন্তানের কর্তব্য।

মায়ের তৃতীয় রূপটি হচ্ছে বিশ্বজননী আদ্যাশক্তি মহামায়ার বিশ্বমূর্তি। অহংভাব বা ‘আমিত্ব’ সত্ত্বাকে বিসর্জন দিয়ে মাতৃসাধক-সন্তান যখন অসীমে অনন্তের পথে চলে যান, তখনই হয় মায়ের দর্শন। যেমন দেখেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব, বামাক্ষ্যাপা, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, বিবেকানন্দ, শ্রী অরবিন্দ প্রভৃতি সাধক ও দেশভক্তগণ। তাঁরা তখন সর্বভূতে মাতৃদর্শন করেন, তখন কালী ও ব্রহ্ম এক হয়ে যায়। লেখক ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্র বিশ্লেষণ করে মায়ের বিভিন্ন রূপের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন,—তিনি বেদমাতা গায়ত্রীমন্ত্র, সাবিত্রী, সরস্বতীরূপে জ্ঞান ও বিদ্যাদায়িনী, অসুরদলনীরূপে তিনি চণ্ডী, দুর্গা, মহাকালী, চামুণ্ডা, ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, মাহেশ্বরী, নারসিংহী, বারাহী, শিবদূতী, নবদুর্গা ইত্যাদি। শক্তিদায়িনীরূপে কালী, তারা প্রভৃতি দশমহাবিদ্যা— তিনি জগদ্ধাত্রী, ভুবনেশ্বরী, কমলা ইত্যাদি মূর্তি ধারণ করেন। তাঁর রূপের কোন পরিসীমা নেই, তিনি জগন্মূর্তি। একদিকে তিনি অশুভ শক্তিকে ধ্বংস করছেন, অন্যদিকে ‘অভয়া’ রূপে ভক্তদের প্রতি তাঁর অভয় হস্ত প্রসারিত। তিনি একদিকে দনুজদলনী মহাশক্তি, অন্যদিকে অনন্ত কল্যাণদাত্রী জগন্মাতা।

অল্প-পরিসরের মধ্যে হলেও লেখক মাতৃভাবনার কিছুটা পরিচয় দেবার যে চেষ্টা করেছেন মাতৃভক্ত ত্যাগব্রতী ভারতমাতার সন্তানদের, বিশেষতঃ আধুনিক প্রজন্মের সন্তানদের নূতনভাবে উদ্দীপিত করে দেশমাতৃকার তথা রাষ্ট্রের সেবায় নিযুক্ত করবে, ‘রাষ্ট্রীয় স্বাহা ন ইদং মম’ এই মন্ত্রে দীক্ষিত করবে, এই আশা রাখি। বইটিতে ছাপার অনেক ভুল রয়েছে বিশেষত সংস্কৃত মন্ত্রগুলিতে। পরবর্তী সংস্করণে সেই ত্রুটিগুলি মার্জিত হওয়ার আশা করবো।

‘মাতৃতন্ত্রের সাধনা ও ভাবনা’ ঃ লেখক -ডঃ অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক-সোমনাথ ঘোষ, প্রকাশনায়-কোলাঘাট লোকশিক্ষা নিকেতন, পো--কোলাঘাট, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, প্রাপ্তিস্থান-(১) বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘ, ২৬, বিধানসরণি, কলকাতা-৬ (২) তুহিনা প্রকাশনী, ১২ পি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, মোঃ-৯৮৩০৫৩২৮৫৮, মূল্য-৭০ টাকা মাত্র।

বইপাড়ার খবরাখবর

উনিশশো সাতচল্লিশ সালের দেশভাগ নিঃসন্দেহে বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে মর্মঘাতী ক্ষত। এর জন্য দায়ী কে? জিন্না? কংগ্রেস? এবার বাংলা ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে সেই বিতর্কিত বইটি। ‘জিন্না, ভারত, দেশভাগ, স্বাধীনতা’। যশোবন্ত সিং রচিত এই বইটির দাম ৫০০ টাকা এবং প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্স। বঙ্কিমচন্দ্র সেন রচিত ‘লোকমাতা রাণী রাসমণি’ বইটি প্রকাশিত হয়েছে। বইটি পাওয়া যাবে মহেশ লাইব্রেরী থেকে। বইটির দাম ৬০ টাকা।

উনিশ শতকে উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা হয়েছিল হুগলী জেলায়। উনিশ থেকে একুশ শতকের ‘উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার’ প্রকাশিত হয়েছে সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার থেকে। প্রবুদ্ধ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত এই বইটির দাম ৩০০ টাকা।

বাংলার দুর্গোৎসবের সঙ্গে শিল্পকলার পরম্পরাগত বিষয় বিন্যাস গড়ে উঠেছে। উৎসবের ঐতিহ্যে বাংলার জনসমাজের বিশেষ সাংস্কৃতিক রূপবৈচিত্র্য আছে দুর্গার পটচিত্রে। দীপঙ্কর ঘোষ রচিত ‘বাংলার পটের দুর্গা’ প্রকাশিত হয়েছে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে। এই বইটির দাম ২০০ টাকা।

এখান থেকেই প্রকাশিত হয়েছে ‘শ্রীমা সারদা ও তাঁর সময়’। মঞ্জুরী চৌধুরী রচিত এই বইটির দাম ১৫০ টাকা। শংকর রচিত ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ রহস্যামৃত’ প্রকাশিত হয়েছে দে’জ পাবলিশিং থেকে। এই বইটির দাম ১০০ টাকা।

এখান থেকেই প্রকাশিত হয়েছে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী আশ্রিত চারটি আধুনিক নাটকের সংকলন। মনোজ মিত্র রচিত ‘রামায়ণী— মহাভারতী’। দাম ১০০ টাকা।

জগজ্জ্যোতি ঃ শতবর্ষ সংকলন

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একসময় আক্ষেপ করে বলেছিলেন, সমস্ত দেশে পাঁচজন লোকও কি বৌদ্ধশাস্ত্র উদ্ধার করাকে চিরজীবনের ব্রত স্বরূপ গ্রহণ করতে পারে না? এই বৌদ্ধ শাস্ত্রে পরিচয়ের অভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস কানা হইয়া আছে। একই উপলব্ধি অনুরণিত হয়েছে সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর কণ্ঠে। ভারতবর্ষের এক সুবর্ণ যুগের বিলুপ্ত প্রায় গৌরবোজ্জ্বল সমৃদ্ধ ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতির জন্য উল্লিখিত মনীষীদের মতো একই ধরনের সত্য উপলব্ধিজাত ক্ষোভ, বেদনা, উদ্ধারের আকুতি প্রতিভা কর্মবীর কৃপাশরণকে দায়িত্ববোধে সচেতন করে তোলে। তাই বৌদ্ধশাস্ত্র দর্শন প্রচার প্রসার, পালি শিক্ষার চর্চা এবং বৌদ্ধ ধর্মের মহিমা প্রচারের জন্য ১৯০৮ সালে কৃপাশরণের নেতৃত্বে আত্মপ্রকাশ ঘটে মাসিক ‘জগজ্জ্যোতি’ পত্রিকার। অজ্ঞানতায় অন্ধকারে সদ্ধর্মের জ্যোতি জ্বালিয়ে অনেক বাধা-বিপত্তি চড়াই উৎরাই পেরিয়ে জগজ্জ্যোতি ২০০৮ সালে শতবর্ষ পূর্ণ করেছে। বাংলার সাময়িকী প্রকাশনার ইতিহাসে বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে গৌরবের বিষয়, যা আগামী প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। বেশ কয়েকজন বৌদ্ধ দার্শনিক এবং পণ্ডিত জগজ্জ্যোতির সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য গুণালংকার মহাস্থবির, ভারততত্ত্ববিদ ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া, সাহিত্যিক শীলানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ। ১৯৮০ সালে বাংলা এবং ইংরেজী দ্বিভাষিত জগজ্জ্যোতি সম্পাদনা করেন হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী। তাঁর নিপুণ সম্পাদনায় শুধু উভয় বাংলায় নয় বিশ্বের সমস্ত গবেষকদের কাছে জগজ্জ্যোতি জনপ্রিয় হয়। বর্তমান শতবর্ষ

দ্বিভাষিক স্মারক গ্রন্থে বেশ কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে 'Buddhist Approach to conflict–An Asokan Retrospection on Peace and Security', 'In quest of a Buddlist Identity', 'Buddlism and Eco-harmony', ‘রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সমসাময়িক সৃষ্টি ও দৃষ্টিতে গৌতম বুদ্ধ’ উল্লেখযোগ্য। ৩৩৪ পৃষ্ঠার এই স্মারক গ্রন্থটিতে আরও বহু মূল্যবান নিবন্ধ ও তথ্য সংকলিত হয়েছে।

বইটির ছাপা প্রায় নির্ভুল। বৌদ্ধশাস্ত্র দর্শন এবং বৌদ্ধ সংস্কৃতি নিয়ে যাঁরা প্রচার প্রসারের দায়িত্বে রয়েছেন তাঁদের জন্য এই সংখ্যাটি এক অমূল্য সম্পদ।

JAGAJJYOTI,
Centenary Volume, Editor : Hemendu Bikash Chowdhury,
Published : Bauddha Dharmankur Sabha. 1. Buddhist Temple St. Kol-12
Price : Rs. 300, Rs. $20

আত্মজ

আত্মজ। আত্মা থেকে জাত। আত্মজ বার্ষিক সংকলন। যার এবারের বিষয় ‘খেলা’। তবে নিছক ছেলেখেলা নয়, জীবনের সব খেলা নিয়ে আত্মজ হেঁটেছে অনুভবের পথে। খেলা নিয়ে কবিতা লিখেছেন প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত। গল্প লিখেছেন প্রচেত গুপ্ত, অনমিত্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। আর গদ্য নিয়ে অবেশ ছড়িয়েছেন বারিদবরণ ঘোষ, নবকুমার বসু, আশিস গিরি, শ্রুতিরাজ প্রহরাজ, নবকুমার ভট্টাচার্য প্রমুখ। আত্মজ নিছক সংকলন পত্রিকা নয়, একটা স্বপূরণের নাম। মৌসুমী ও পিনাকপাণির প্রতি বিবাহ বার্ষিকীকে উপলক্ষ করে নতুন নতুন রূপে প্রকাশ পায় আত্মজ। এ পত্রিকা ব্যবসা করে না, তাই কোনও স্টলে পাওয়া যায় না। তবু পেতে গেলে একমাত্র ভালোবাসার দাবি নিয়ে যোগাযোগ করতে পারেন — পাখির বাসা। ফ্ল্যাট - ৫০১, নান্দনিক। ১৬৩, ভূপেন্দ্র নাথ রোড, উত্তরপাড়া, হুগলী।

বই প্রকাশ ও সাহিত্যসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা।। গত ৭ নভেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় মহাবোধি সোসাইটি হলে স্বামী আত্মবোধানন্দ রচিত ‘দিব্যজননী সারদা’ বইটি প্রকাশিত হয়। রূপকথা (২০ কেশব সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৯) সংস্থার প্রকাশিকা ঊষসী সাহা এই উপলক্ষে স্বামীজী-মা-বিবেকানন্দের ভাবধারা নিয়ে এক আলোচনারও ব্যবস্থা করেন। উদ্বোধনী সঙ্গীত ও বৈদিক মঙ্গলাচরণের পর বক্তব্য রাখেন, সাংবাদিক অরণি বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়ন্ত সিংহ, শিক্ষাবিদ ও প্রাবন্ধিক সন্দীপ কুমার দাঁ, অধ্যাপক শঙ্কর ঘোষ, আলোকচিত্রী অতুণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিজ্ঞানী শ্রীজীব দাস প্রমুখ। আবৃত্তি করেন পুষ্পিতা দত্ত। স্বামী আত্মবোধানন্দের পরিচালনায় অনুষ্ঠানটি মনোজ্ঞ ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

একান্ত সাক্ষাৎকারে শুভাপ্রসন্ন

“ফ্যাসিস্ট দের জন্ম দেওয়া কমিউনিজম পৃথিবীতে কোথাও গ্রহণযোগ্য হয়নি”

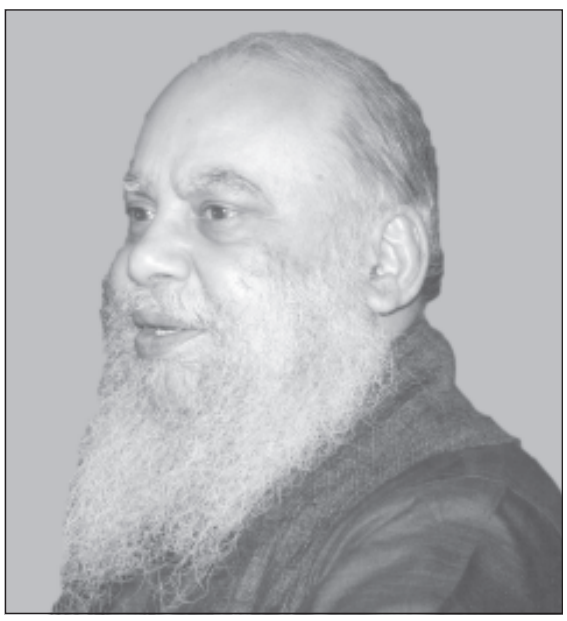

“কি যেন ভট্টাচায্যিমশাই সম্পাদক ছিলেন আপনাদের”? ভবেন্দু ভট্টাচার্য। “হ্যাঁ, হ্যাঁ। উনি আমায় খুব স্নেহ করতেন। আমি মনে করি স্বস্তিকা আজকের সমাজব্যবস্থায় দাঁড়িয়ে যে চিন্তাভাবনা করছে, তার দরকার রয়েছে। কিন্তু যখন একটা রাজনৈতিক স্বার্থ তাতে এসে পড়ে.... আজকালকার দিনে তাই বা অস্বীকার করি কেমন করে।” মানুষেই ‘আস্থাভাজন’ শিল্পী শুভাপ্রসন্নকে রাজনৈতিক বাতাবরণে চিনলেন স্বস্তিকা-র প্রতিনিধি অর্ণব নাগ।

❑ **স্বস্তিকা ঃ** আপনি একটা কথা প্রায়ই বলে থাকেন—আপনি যে জগতের লোক তার ভাষা বাঙ্ময় নয়। যদি সেই ভাষাতেই আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই...। ধরুন বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে আপনার হাতে দুটি তুলি রয়েছে। একটার রঙ লাল, অন্যটা কালো। তাহলে আপনার ক্যানভাসে আজকের পশ্চিমবঙ্গের ঠিক কোন ছবিটা ফুটে উঠবে? এবং এর কোন অংশে লাল আর কোন অংশে কালো রঙ থাকবে?

● **শুভাপ্রসন্ন ঃ** বলতে দ্বিধা নেই। এটা ঠিক নয়। আমরা সমস্ত রঙ নিয়ে কাজ করি। কোনও নির্দিষ্ট লাল বা কালো-র মধ্যে সীমাবদ্ধ নই। চিরকাল বিশ্বাস করে এসেছি, রামধনুর যে সাত রঙ তার থেকে আমরা সহস্র রঙ তৈরি করার চেষ্টা করি, কাজেই যদি প্রতীকি অর্থেও আমায় আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতেই হয় তবে সাদা বা কালো কিংবা লাল বা কালো এর মধ্যে আমাদের স্বপ্ন, আমাদের চিন্তা, আমাদের কাজ সীমাবদ্ধ নয়। হ্যাঁ, আমি মূলত চিত্রকর। শিশুকাল থেকে ছবি আঁকব—এমনই স্বপ্ন চিরকাল দেখে এসেছি। আজও জীবনের কিছুটা পরিণত সময়ে সেই কাজ একনাগাড়ে করে চলছি। একদিন স্বপ্ন দেখতাম, কষ্ট পেতাম। এখনও স্বপ্ন দেখি। অতটা হয়ত ওইভাবে ব্যক্তির জীবন-যন্ত্রণায় কষ্ট পাই না। কিন্তু মানুষের দুঃখ-দুর্দশা স্বাভাবিকভাবেই আমাকে দুঃখ দেয়। তখন মনে হয়, আমাদের কথা বলা দরকার, এগিয়ে যাওয়া দরকার। প্রতিবাদ করা দরকার।

❑ আপনি বললেন যে রামধনুর সাত রঙ আপনার ক্যানভাসে ফুটে ওঠে। মানুষ প্রতিবাদ করছে এটা দেখেই কি আপনার ক্যানভাসে সাত রঙ খেলা করছে। মানে বলতে চাইছি আজ থেকে বছর তিনেক আগে যখন হয়তো মানুষের প্রতিবাদটুকুর অস্তিত্ব ছিল কিন্তু তা ভোটবাক্সে প্রতিফলিত হোত না, আজ হচ্ছে। এই তৃপ্তিটাই কি আজ রামধনুরূপে উদ্ভাসিত হচ্ছে আপনার ক্যানভাসে?

● স্বপ্ন এক জিনিস। আমরা যেহেতু বর্ণ নিয়ে চিন্তা করি, বর্ণ নিয়ে আমাদের কাজ, সেহেতু আমি বর্ণের যে নানান রূপ সেই নিয়ে প্রতীকি কথা বললাম। কিন্তু এখানে যদি সেইভাবে প্রতীকি মিলিয়ে দেওয়া যায়—যে অসংখ্য শ্রমিক, অসংখ্য কৃষক, অসংখ্য আদিবাসী, পিছিয়ে পড়া মানুষ—এগুলো তো সব রঙ। দুঃখের রঙ আছে, সুখের রঙ আছে; কৃষকের রঙ আছে, শ্রমজীবীর রঙ আছে;ধনী লোকের রঙ আছে, দরিদ্রের রঙ আছে। সুতরাং আমাদের কাছে যা রঙ হিসেবে ধরা দেবে আমরা তাই আঁকব।

❑ যদি ধরে নিই বর্তমানে রাজ্যের সবচেয়ে বড় সমস্যা মাওবাদ এবং তাতে কিন্তু প্রকারান্তরে বুদ্ধিজীবীদের নাম জড়িয়ে গেছে। এর একটা সম্ভাব্য কারণ কি এটাই যে বুদ্ধি জীবীরা মনে করছেন সিপিএম নামক বামপন্থীরা ভুল কিন্তু বামপন্থা সঠিক?

● আমরা এইরকম রাজনৈতিক চিন্তায় মানুষকে দেখি না। এটা কিছু নির্বোধ মানুষ তকমা দিয়ে আমাদের সম্পর্কে ভাবার চেষ্টা করে। আমি বিশ্বাস করি ভারতবর্ষের সমস্যা মাওবাদ নয়। আমাদের সমস্যা দারিদ্র, বঞ্চিত মানুষ, ভারতবর্ষের সমস্যা দুর্গত সন্ত্রাসী সন্ত্রাসে ভীত মানুষ। এইসব মানুষকে নিয়ে বহু মানুষ রাজনীতি করছে। মাওবাদীরাও রাজনীতি করছে। আমি বিশ্বাস করি, কমিউনিজম হয়তো কোনও আধুনিক পৃথিবীতে কিছু বিশেষ ‘দর্শন’ দেখাতে পেরেছিল। কিন্তু বাস্তবে কমিউনিজম পৃথিবীতে কোথাও গ্রহণযোগ্য হয়নি। কমিউনিজম সেই ফ্যাসিস্টদেরই জন্ম দেয়। যেভাবে একধরনের রাজতন্ত্রকে আমরা ঘৃণা করেছি। আধুনিক জগত কখনও রাজতন্ত্র, শোষণতন্ত্রকে স্বীকার করেনি। তাদের বর্জন করেছে। ঠিক তেমনি রাজতন্ত্রের আরেকটা আধুনিক রূপ দলতন্ত্র। সেই দলতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সারা পৃথিবী ব্যাপী—তা কমিউনিস্টদের কাজ। সুতরাং কার্ল মার্কসের যে দর্শন, যেটা প্রয়োগ করেছে কিছু ক্ষমতালোভী মানুষ। প্রয়োগের মাধ্যমে তারা সেই দর্শনকে রাজনীতিতে ঢোকাবার চেষ্টা করেছে। তাদের প্রয়োগ সঠিক নয়। দর্শন হিসেবে সেটা ঠিক হলেও, বাস্তবে তা সারা পৃথিবীর মানুষকে...। বরঞ্চ বঞ্চি তদের সবচেয়ে বেশি বঞ্চ না, মানুষ হিসেবে তার পৃথিবীতে বেঁচে থাকার স্বাধীনতা সেটাকে হরণ করেছে কমিউনিস্টরা। সুতরাং আপনাদের এবিষয়ে পরিষ্কার হওয়া দরকার যে আমরা কমিউনিজম দর্শনের বিরোধী নই। কিন্তু কমিউনিস্ট শাসকরা যেভাবে পৃথিবীব্যাপী জাল বিস্তার করেছিল তাদের পঞ্চাশ-ষাট বছরও যায়নি এই পৃথিবী থেকে মুছে যেতে। আমরা আহাম্মক, তাই আমরা টিকিয়ে রেখেছি এই পশ্চিমবঙ্গে। কিন্তু এখন মানুষ জেগেছেন, মানুষ বুঝতে পেরেছেন, সুতরাং মানুষকে আর বোকা বানানো যাবে না। কমিউনিস্টরা লোপাট হয়ে যাবে।

❑ জানি না আপনি এটাকে সন্ত্রাস বলতে চাইবেন কিনা কিন্তু অরুণাচলে দলাই লামার সফরকে কেন্দ্র করে চীন যেভাবে হুমকি দিয়ে চলছে তার প্রতিক্রিয়ায় বামপন্থীরা কিন্তু চুপচাপ। মাও থেকে মার্কস—এদের ওপর চীনের প্রভাব কতটা রয়েছে বলে আপনি মনে করছেন?

● কমিউনিস্টরা কি বলল তাতে আমার কিছু যায়-আসে না। মানুষকে এতদিন এরা অমানুষ করে রেখেছিল তাই হয়তো মানুষ কিছুটা অন্ধকারে ছিলেন। আমার কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ মানুষ কি বলল। তবে যে উগ্রতা কমিউনিজমের হাত ধরে এসেছে তা নিঃসন্দেহে ক্ষতিকারক।

❑ একটা সত্যি কথা আমাকে বলুন। আপনারা বহুদিন থেকেই যে পরিবর্তন দাবী করে আসছেন, বর্তমানে কি ঠিক সেই ধরনের পরিবর্তনই আপনি দেখতে পাচ্ছেন?

● আগে আমি দেখি! গণতন্ত্র যখন আমরা মেনেছি তখন তো বিরোধীদের সুযোগ করে দিতেই হবে। যাঁদের হাত ধরে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটতে চলেছে, তাঁরা তো মানুষের কষ্ট, মানুষের ওপর অত্যাচার, নির্যাতন, শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব এই সমস্ত তো দিন-রাত দেখতে পাচ্ছেন। তাঁরাও যদি শাসকপক্ষের মতো সেই পথ অবলম্বন করে এগুলো সংশোধন করার ভাবনায় নিজেরা যুক্ত না হন, তবে তো মানুষ থেমে থাকবে না। সুতরাং আমি এনিয়ে এখনই কোনও মন্তব্য করব না। যখন মানুষের ‘কনসিভ পিরিয়ড’ হয় তখন তাকে বেশি বিরক্ত করতে নেই। এখন সেই ধারণ করার সময়।

❑ কিন্তু রাজনীতির কারণে এই মুহূর্তে থমকে রয়েছে উন্নয়ন। রাজ্যবাসী এই দোদুল্যমান অবস্থা কি ২০১১ পর্যন্ত ভোগ করতে বাধ্য হবেন?

● আমার তো মনে হয়, মানুষ যেভাবে জেগেছেন হয়তো অতদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না। এর জন্যে কোনও ৩৫৬ জারি করার বা কোনও আইন করার প্রয়োজন নেই। মানুষ এদের প্রত্যাখ্যান করলে তা আইনের জন্য থমকে থাকবে না।

❑ কিন্তু এই সরকার এখনও ‘আমরা ২৩৫, ওরা ৩০’ এই তত্ত্বে আটকে আছে। আপনি কিভাবে আশা করেন যে ২০১১-এর আগেই এরা ইস্তফা দেবে?

● আজকে রাজ্য যে পরিস্থিতিতে গিয়ে পৌঁছেছে, তা ইঙ্গিত দিচ্ছে এরা এবার গলাধাক্কা খাবে। মানুষই গলাধাক্কা দেবে।

❑ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে ভোটব্যাঙ্ককে, সেটা আদিবাসীদের হতে পারে বা মুসলিমদের হতে পারে,—কিভাবে দেখেন?

● আমি এসবে বিশ্বাসই করি না। ব্যাঙ্ক মানে তো মানুষকে গোরু ভাবা। অর্থাৎ একজন মানুষ নির্দেশ দিচ্ছে আর গোরু-ভেড়ারা গড্ডালিকা প্রবাহের মতো তা অনুসরণ করছে। আমি মনে করি মানুষ সজাগ রয়েছেন। একটি দরিদ্রতম ক্ষমতাহীন মানুষের ভোটের যা মূল্য, ভারতের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী মানে প্রধানমন্ত্রীর মতো মানুষের ভোটেরও তাই মূল্য।

❑ কিন্তু বাস্তব চিত্রটা তো অন্যরকম। ইমাম যা বলছেন মুসলমান সম্প্রদায় তো চোখ-কান বুজে তাই করছে।

● আমি মনে করি এই বাস্তব চিত্রের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। অনেকেই অনেককে প্রভাবিত করতে পারে। আমি মনে করতে চাই, মানুষ তার স্বাধীন ভাবনা, স্বাধীন অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবে। আমি শুধু ইমামকেই বা দোষ দেব কেন? অনেক গুরুকেই দোষ দিতে পারি। আমার মনে হয় কেউ কারুকে প্রভাবিত করতে পারে না। এমনকী এই যে মমতা ব্যানার্জীর ডাকে অসংখ্য মানুষ জড় হচ্ছেন, তাঁকে কোটি কোটি মানুষ ভোট দিচ্ছেন-এটাকে কি তবে বলবেন মমতার ব্লক-ভোট?

❑ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। মানুষকে আহ্বান জানানোর মধ্যে তাঁর একটা ভোটের স্বার্থ লুকিয়ে আছে। কিন্তু ইমামের স্বার্থটা কি?

● না না, একজন ধার্মিক ব্যক্তিত্বও এটা করতে পারেন। তিনি যদি মনে করেন, তাঁর শিষ্যের কল্যাণের জন্যে ‘আমি একথা বলতে পারি’ তবে তিনি তা অবশ্যই বলবেন। এগুলোকে আমরা ব্লক বলে ভাবব কেন? এগুলোর মধ্যেই মানুষকে ভেড়া ভাবার একটা প্রবণতা লুকিয়ে রয়েছে।

❑ তার মানে রাজনীতি ও ধর্ম যদি মিশে যায় তাতে আপনি অন্তত আপত্তির কোনও কারণ দেখছেন না।

● কে মেশাচ্ছে? মেশানোর তো কোনও কারণ নেই। কিছু চতুর ধর্মগুরুও আছে। কিছু চতুর রাজনীতিবিদও আছেন। চতুর রাজনীতিবিদ চতুরতার সঙ্গে মানুষকে প্রভাবিত করেন, চতুর ধর্মগুরুও চতুরতার সঙ্গে মানুষকে প্রভাবিত করেন। ধর্মগুরুর কাজ চেতনার উন্মেষ ঘটানো। তা না করে তিনি যদি কাউকে অন্ধ করে দেন, তাহলে তিনি ধর্মগুরুই নন, সে ইমামই হোন আর যেই হোন।

❑ দেওবন্দের ‘বন্দেমাতরম্’-এর ওপর ফতোয়া নিয়ে আপনার প্রতিক্রিয়া?

● ধুর! ওটা একটা ফালতু ব্যাপার। আমি মনে করি মাতৃবন্দনায় প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে। আগেকার দিনে অনেক মুসলিম নেতারা ছিলেন যাঁদের ‘বন্দেমাতরম্’ গাইতে কোনও আপত্তি ছিল না। এটাকে এত গুরুত্ব দেবার দরকার নেই।

❑ ছত্রধর মাহাতোকে মাওবাদী বলে মনে করেন?

● এটা আমার মুখ দিয়ে এত বেশি আলোচিত হয়েছে যে এনিয়ে আর নতুন করে কিছু বলবার নেই। ছত্রধরকে ফোকাস করেছে তো মিডিয়া। ছত্রধর একজন মানুষ। শুনেছি লালগড়ে নির্যাতিত কিছু মানুষদের জড়ো করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু যত না জড়ো করেছেন, তার থেকে অনেক বেশি নিজেকে প্রচারের আলোয় আনবার চেষ্টা করেছেন। আর রাজ্যের এই সংকটময় পরিস্থিতিতে কে ছত্রধর, কে অতীন্দ্র— এগুলো আমার কাছে কোনও বড় বিষয় নয়।

❑ কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী ও তৃণমূল-কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মুকুল রায় তাঁর নিজের প্যাডে চিঠি ছাপিয়ে পাঁচ লক্ষ যুবককে চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এটা কেন হলো?

● আমি সেই চিঠি দেখেনি। তোষণের রাজনীতি হচ্ছে কিনা, এ নিয়ে ভাবি না। কারণ আমি প্রত্যক্ষ রাজনীতি করি না। কিন্তু আমি হিপোক্র্যাটও (ভণ্ড) নই। আমার রাজনীতি- বোধ রয়েছে। যা হচ্ছে সবই বিচার করবেন মানুষ।

❑ প্রতিষ্ঠান-বিরোধী স্রোত পুরোটাই এখন তৃণমূলের পালে। তার সহযোগী বিরোধী দলগুলোর প্রয়োজন এই মুহূর্তে আদৌ আছে কি? বিশেষ করে সাম্প্রতিক উপনির্বাচনে গোয়ালপোখরে দীপা দাশমুন্সির দলের হারের পর তেমনটাই মনে হচ্ছে।

● সমস্ত কিছু মানুষের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভাল। কোন দল কতটা গ্রহণযোগ্য সেটা নাহয় মানুষই বিচার করলেন!

❑ আমার শেষ প্রশ্ন। একটা সত্যি কথা আমাকে বলবেন? এই যে ধরুণ, লালগড় কিংবা আরামবাগ অথবা খানাকুল—এইসব অস্থির রাজনৈতিক হিংসা কি আপনার ছবিতে অবচেতনেও কোনও প্রভাব ফেলে না?

● নিশ্চয়ই হয়তো ফেলে। তবে ছবি অনেক বিমূর্ত। সুখ-দুঃখের প্রতিক্রিয়া একজন সাংবাদিকের কাছে যেভাবে ধরা দেয়, একজন সৃষ্টিশীল মানুষের কাছে সেভাবে ধরা দেয় না।

❑ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

● আপনাদের স্বাগত।

"তালাক" থেকে সাবধান

বাংলায় একটা প্রবাদ আছে "নিশ্চয়তাকে ছেড়ে অনিশ্চয়তার দিকে পা বাড়ালে অতল গহ্বরে পতিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।" সম্প্রতি ঢাকা থেকে আমাদের অফিসে একটি দুঃসংবাদ এসে পৌঁছেছে। এক সর্বভারতীয় শ্রমিক সংস্থার সভাপতি (প্রয়াত) মহাশয়ের প্রথমা কন্যা (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারিণী) এক হিন্দু সুপুরুষ উচ্চ শিক্ষিত ভদ্রলোক এর সাথে একবৎসর বিবাহিত জীবন-যাপনের পর জনৈক বাংলাদেশী মুসলমানের প্রেমের ফাঁদে পড়ে। তিনি বিবাহ বিচ্ছিন্ন করে বাংলাদেশী মহম্মদ সেলিমকে বিবাহ করার জন্য ঢাকায় পাড়ি দেন। সেখানে ইসলাম ধর্ম কবুল করে মুসলমানী হয়ে ১৪ বৎসর বিবাহিত জীবন-যাপন করেন।

গত ১৯/১০/০৯ তারিখে রাত্রে তাঁকে 'তালাক তালাক তালাক' বলে তালাক দিয়ে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বাড়ী থেকে রাস্তায় বের করে দেয় মহঃ সেলিম। তাদের একটি কন্যা সন্তানও আছে। ওই রাতেই টেলিফোনে এই সংবাদ কলিকাতায় আসার পর এখান থেকে ঢাকায় কিছু শুভানুধ্যায়ীর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁকে পুলিসের সাহায্যে এক সরকারি হোমে রাখার ব্যবস্থা হয়। আমাদের সংবাদদাতা ঢাকা থেকে জানতে পরেছে—যে ওই ধর্মান্তরিতা বর্তমানে সুবিচার পাবার আশায় তার শ্বশুরবাড়ি রাজশাহীতে গেছেন।

ইসলাম ধর্মমতে একবার তালাক হয়ে গেলে যদি পূর্বের স্বামীর কাছে ফিরতে চান তবে অন্য একজনের সাথে নিকাহ্ করে একই শয্যায় রাত্রিবাস ও দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। তার পর নূতন স্বামী তালাক দিলে পরে আবার পূর্ববর্তী স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যাবে। এই পরিণতি দেখার জন্য আমাদের আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ দত্ত, সম্পাদক, ও বি সি সংবাদ, এফ ৬/১ সল্ট লেক, কলকাতা-৬৪

আবার বন্দেমাতরমে মুসলিম ফতোয়া

৩রা নভেম্বর হায়দরাবাদে জামায়ত উলেমাএ হিন্দ ও আরও ১টি তথাকথিত সংগঠনের সমর্থনে মুসলিমদের 'বন্দেমাতরম্'-গাওয়া উচিৎ নয়, বলে ফতোয়া দিয়েছে। তবে প্রস্তাব পাশ করে লিখিত প্রস্তাবে বলেছে হজরত মহম্মদ দেশকে ভালবাসতে বলেছেন তাই তারা দেশকে ভালোবাসেন কিন্তু ওই গান তাদের ভাবাদর্শের বিরোধী। বন্দেমাতরম্‌কে নিয়ে কাটা-ছেঁড়া করা ও ফতোয়া দেওয়া আগেও অনেক বার হয়েছে। কিন্তু হিন্দু বা ভারতীয় নেতারা উক্ত মৌলবাদী সংগঠনগুলির কোন ও নিন্দা বা সমালোচনা করেননি।

উক্ত সভায় যোগদান করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদম্বরম্ সাহেব নাকি বাবরি-ধাঁচা ভাঙার জন্য অশ্রুপাত করেছেন। আমার প্রশ্ন, হিন্দুরা বা কেউ কি বলেছে মুসলিমদের বন্দেমাতরম্ গাইতে হবেই। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় অবিভক্ত ভারতে একসময় মুসলমান সংখ্যা ছিল ৯ কোটি আর হিন্দু ২২ কোটি। তাই হিন্দুরাই সংখ্যাধিক্যের কারণে বৃটিশ শাসকের বিরুদ্ধে জীবনপণ করে স্বাধীনতার যুদ্ধে বন্দেমাতরম্ বলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কতিপয় মুসলমানরাও হিন্দুদের সাথে একযোগে লড়াই করেছিলেন ও জীবন বলিদান করেছিলেন। তখন কিন্তু বন্দেমাতরম্ নিয়ে কোনও কথা ওঠেনি। যখন বৃটিশের পরামর্শে জিন্না পাকিস্তান দাবী বা ভারত ভাগের দাবী নিয়ে ডাইরেক্ট এ্যাকশনের ডাক দিল তখন গান্ধীজী-নেহরু প্যাটেলরা তা মেনে নেন। আসলে বন্দেমাতরম্ শুনলেই মোল্লাবাদী ও কংগ্রেস-সি পি এম এর কেমন যেন গা ছম্ ছম্ করে। মমতাও একবার বন্দেমাতরম্ বললে তিন বার ইন-শা-আল্লাহ বলেন। তা বলুন! সকলেরই তো মুসলিম ভোট প্রয়োজন শুধু বিজেপি ছাড়া। মুসলিম ভোট ঠেকাতে সি পি এম কী-ই না করেছে? বানতলা, ধানতলার ঘটনা পাঠক স্মরণ করুন। বানতলায় পরিবার কল্যাণ বিভাগের কর্মী অনিতা দেওয়ানের কথা মনে করুন। অনিতা মুসলিম মহিলাদের মধ্যে খুব ভালো ভাবে কাজ করছিলেন। গরীব মুসলিম মহিলারা অনিতার বানতলার ক্যাম্পে আসতেন খুবই উৎসাহের সাথে। হঠাৎ একদিন তথাকথিত সিটু নামক কিছু মুসলিম শ্রমিক শ্রেণীর লোক অনিতাকে যেভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ঘটনা চেপে দেওয়া হয়েছিল জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী ও বুদ্ধ বাবু পুলিশমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে। জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ইসলাম বিরোধী বলেই এ হত্যা সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান ও বাংলাদেশে বা এশিয়ার অন্যান্য মুসলিম দেশে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ নিয়মমতো করা হচ্ছে। মুসলমান ভোটের জন্য কংগ্রেস সিপিএম জনতা ও অন্যান্য ছোট বড় দলের কামড়া-কামড়ি একটি করুণ পরিণতির দিকেই নিয়ে যাচ্ছে দেশকে।

বৈদ্যনাথ ঘোষ, বারাসাত, উঃ ২৪ পরগণা

ওবামার নোবেল প্রাপ্তি

অতি সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক হুসেন ওবামা নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি তথ্য তুলে ধরতে চাই।

১। বারাক হুসেন ওবামা একজন মুসলিম বলে সংবাদমাধ্যমগুলি যতই চিৎকার করুক না কেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হতে হলে সেই ব্যক্তিকে অবশ্যই ক্যাথলিক খ্রীষ্টান হতে হয়। অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পূর্বেই ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন ওবামা।

২। নোবেল শান্তি পুরষ্কারের জন্য মনোনয়ন শেষ হয়েছিল ওবামার কার্যভার গ্রহণের দু'সপ্তাহের মধ্যেই।

৩। ওবামা বিশ্বের শান্তি তো দূরে থাক এখনও আফগানিস্তান এবং ইরাক থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করার আদেশ বা তার কোন উদ্যোগই গ্রহণ করেননি।

তাই ওবামা নিজেও হয়ত বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন তার এই পুরস্কার প্রাপ্তিতে। সুতরাং ওবামাকে পুরস্কার প্রদান কতটা যুক্তিপূর্ণ তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। মুসলমান যুবকরা কদাচ ধর্মান্তরিত হয়। তারা স্ত্রীকেই ইসলামে ধর্মান্তরিত করে। সেক্ষেত্রে মুসলমান পিতার সন্তান হিসেবে বারাক হুসেন ওবামা' মুসলমানই—এরকম ধরে নেওয়াটা ভুল হবে না।

তবে শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণেই এই বিরল সম্মান নাকি মার্কিন প্রশাসনকে সন্তুষ্ট করতে নোবেল কমিটির এই সিদ্ধান্ত—তা সময়ই বলতে পারবে।

রাজু হালদার, জামালপুর, বর্ধমান

গান্ধী-কথা

শিবপ্রসাদ লোধ তাঁর নিবন্ধে (স্বস্তিকা, ২।১১।০৯) বলেছেন,—১৯২৪ সালে জিন্নাকে গান্ধীজী কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট করেছিলেন। তথ্যটি যে ঠিক নয়, আগের একটি কথাই তার প্রমাণ। সেখানে তিনি বলেছেন—১৯২০ সালে জিন্না কংগ্রেসের সদস্যপদ ত্যাগ করেছিলেন। বলা বাহুল্য, কংগ্রেসের সদস্য না হয়ে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হওয়া যায় না। তাছাড়া, ১৯২৪ সালে গান্ধীজী স্বয়ং কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন—(সূত্রঃ 'A Dictionary of Indian History'–S. Bhattacharya)। মহম্মদ আলি জিন্না কোনও কালেই কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট ছিলেন না।

এখানে আর একটি ঘটনার উল্লেখ, মনে হয়, অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমাদের অনেকের ধারণা, গান্ধীজী আজীবন কংগ্রেস-সদস্য ছিলেন। চলতি এই ধারণার বশে সম্প্রতি কলকাতার একটি ইংরেজী দৈনিকের নিয়মিত কলাম-লেখক গান্ধীজী "lifelong" কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। তথ্যটি যে ঠিক নয় সে কথা জানিয়ে একটি পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল; কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। সম্ভবত, সম্পাদক মহাশয়ের বাজে কাগজের ঝুড়িতে ওটার গতি হয়েছে।

ঘটনা হল, ১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে বম্বেতে বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে গান্ধীজী কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর সুদীর্ঘ সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই, ১৯৩৪ সালের পর থেকে তিনি কংগ্রেসের কোনও পদাধিকারী বা প্রাথমিক সদস্য ছিলেন না। তা সত্ত্বেও, তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে এক অদ্ভুত সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছিলেন। সে সম্পর্কে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন—"Since 1934 he (Gandhi) not only held no office but had ceased to be even a primary member of the Congress; yet he attended the meetings of the Working Committee and the A.I.C.C. and took part in their discussions"। পট্টভি সীতারামাইয়ার বর্ণনায় গান্ধী "though not a member of the Congress, was still the power behind the throne", গান্ধীকে "permanent super-president of the Congress" বলে উল্লেখ করে নেহরুর মন্তব্য ছিল—"Congress at present means Gandhiji"–(দ্রঃ 'History of Indian National Congress'–P. Sitaramayya)। আপাতত, এখানেই শেষ করছি।

বিমলেন্দু ঘোষ, কলকাতা ৬০

ফুটপাথে হকার-রাজনীতি

সম্প্রতি আদালতের নির্দেশে কলকাতার কতিপয় ফুটপাথ থেকে হকার উচ্ছেদ শুরু হয়েছে। এই সবই নিয়ম রক্ষার নাটক। বামফ্রন্ট জামানায় কলকাতায় আরও দু-একবার হয়েছিল। তখনও এই বামপন্থী হকার-সংস্কৃতি মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। কারণ যে রক্ষক সেই ভক্ষক।

কলকাতায় এই বামপন্থী হকার-সংস্কৃতির সূচনা হয় পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট জমানার-সূচনা পর্বে। তখন চীনের ক্ষমতা দখলের শ্লোগান "গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরে ফেলো" কার্যকর করতে বামপন্থীরা গ্রাম থেকে হাজার হাজার লোক এনে কলকাতার ফুটপাথ ভরিয়ে দিয়েছিল। কিছুদিন পরে কিছু মানুষ ফুটপাথ ছেড়ে গ্রাম-গঞ্জে ফিরে গেলেও সেখানের ছোট-খাটো ব্যবসায়ীরা ফিরে যায়নি। তারা সমস্ত ফুটপাথ জুড়ে শুরু করে দেয় তাদের দোকানপাট। এদের মধ্যে বাঙালী-অবাঙালী সবাই ছিল। দোকানদারদের কাছ থেকে তোলা আদায় করে বামপন্থীরা তাদের পার্টির তহবিল স্ফীত করার জন্য গড়ে তোলে হকার্স ইউনিয়ন।

বামপন্থীদের এই হকার-সংস্কৃতি এখন ভারতবর্ষের অন্যান্য শহরেও ছড়িয়ে পড়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দলীয় ক্যাডার রাজনীতি। চীন-ভারত বাণিজ্য চুক্তির কারণে ভারতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ বাণিজ্যিক স্বার্থে চীন দেশের বিভিন্ন শহরে যাতায়াত করেন। তাদের কাছে একটু খোঁজখবর নিলেই জানা যায়, চীনের বিভিন্ন শহরেও চলছে বেকার সমস্যা সমাধানের এই সহজ সূত্র—ফুটপাথে হকার বসানোর খেলা।

শ্যামাপ্রসাদ দাস। অশোকনগর। উত্তর ২৪ পরগণা।

স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের বক্তব্য ঃ চীনই ভারতের পক্ষে বিপজ্জনক

এন সি দে।। গত ৬ নভেম্বর স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের কেন্দ্রীয় সমিতির বৈঠকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সর্বভারতীয় প্রচারক প্রমুখ মদনদাসজী, কলকাতাসহ বিভিন্ন উচ্চ-ন্যায়ালয়ের বিচারপতি প্রভাকর মিশ্র, স্থানীয় সাচাবাবা আশ্রমের শ্রীশ্রী গোপাল মহারাজ, উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন স্পীকার কে. এস. ত্রিপাঠি, বি. জে. পি. সভাপতির সচিব মুরলীধর রাও এবং মঞ্চের বর্তমান সংযোজক অরুণ ওঝা। প্রত্যেক বক্তাই তাঁদের বক্তব্যে বর্তমান ভারতকে রক্ষার একমাত্র চাবিকাঠি হিসাবে স্বদেশী আচার-আচরণ ও প্রকল্প গ্রহণের মধ্য দিয়ে স্বদেশী অর্থনীতি, শিল্পনীতি ও প্রশাসনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার নির্দেশ দেন।

তাদের মতে, স্বদেশী অবধারণা এক নিত্য-নতুন চিরপুরাতন অবধারণা। ঋষি অরবিন্দ একে ভারতীয় স্বতন্ত্রতা বলে উল্লেখ করেছিলেন। এই অবধারণাকেই ভারতীয় জনমানসে মূলমন্ত্রে পরিণত করতে পেরেছিলেন লোকমান্য তিলক, বীর সাভারকর, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের মত মহানুভব নেতৃত্ব। বিদেশী শাসন থেকে মুক্তির প্রেরণা যুগিয়েছিল এই স্বদেশী মন্ত্র। কিন্তু বক্তাগণ স্মরণ করিয়ে দেন যে আজ আবার নতুন করে স্বদেশী স্বতন্ত্রতা আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কারণ WTO-র চাপে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার যেসব আর্থিক নীতি গ্রহণ করছে তার দ্বারা আমাদের আর্থিক স্বতন্ত্রতা ক্রমেই লোপ পেয়ে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে তা রাজনৈতিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংকটেরও সৃষ্টি করবে। মুরলীধর রাও বথ নির্দেশিত কৃষি-চুক্তির ফলে ভারতীয় কৃষিতে যে চরম সংকট শুরু হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ দেন।

চীন যে ভারতের পক্ষে ক্রমেই এক ভয়াবহ বিপদ হিসাবে দেখা দিচ্ছে সে সম্পর্কে এক যুক্তিপূর্ণ সাবলীল ভাষায় বক্তব্য রাখেন ডঃ ভগবতী প্রসাদ শর্মা, মঞ্চের অখিল ভারতীয় সহ-সংযোজক। চীন আজ হিন্দুস্থানকে ভাগ করতে চাইছে। কেন্দ্রের স্বদেশ বিরোধী সরকার থাকায় চীনের আস্পর্ধা আজ এতটাই বেড়ে গেছে যে তারা ভারতের দুটি ভূখণ্ডের অধিবাসীদের তথা কাশ্মীর ও অরুণাচল প্রদেশের জনগণকে নিজেদের দেশের নাগরিক হিসাবে চিহ্নিত করে পাসপোর্ট-ভিসা ছাড়াই চীন ভ্রমণে উৎসাহিত করছে। আর আমাদের দেশের চীনা প্রকল্পগুলোতে বে-আইনীভাবে তাদের দেশের শ্রমিকদের নিয়োগ করছে।

তারা এদেশে ঢুকছে ব্যবসায়ী হিসাবে, পাসপোর্ট নিয়ে কিন্তু এখানে কাজ করছে শ্রমিক হিসাবে। এদের মাধ্যমেই চীন নানান তথ্য আদান-প্রদান করছে। অরুণাচল প্রদেশে যখন তখন ঢুকে পড়ছে, এ দেশের রাষ্ট্রবিরোধী সন্ত্রাসবাদীদের অস্ত্র যোগান দিচ্ছে।

দ্বিতীয় দিন এক বিশাল স্বদেশী যাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। যা শহরের নাগরিক জীবনে এক ঐতিহাসিক প্রেরণার সৃষ্টি করে।

সম্মেলনের সমাপ্তি ভাষণ দেন অরুণ ওঝা।

চক্ষু-শিবির

গত ১৪ নভেম্বর শনিবার হুগলী জেলার রিষড়ায় প্রেমমন্দির আশ্রমে চক্ষু-ছানি নির্ণয় শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। 'প্রেমমন্দির জনকল্যাণ সমিতি' পরিচালিত এই শিবিরে ২২৯ জন ব্যক্তিকে পরীক্ষা করা হয়।

সল্ট লেকের রোটারী নারায়ণ নেত্রালয় থেকে ছয়জন চক্ষু-বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ৬১ জন ব্যক্তির ছানি নির্ণয় করেন। ২ এবং ৪ ডিসেম্বর সল্ট লেকের রোটারী নারায়ণ নেত্রালয়ে নির্বাচিত ব্যক্তিদের অপারেশন হবে।

প্রেমমন্দির আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ রত্না দে (নাগ) (সাংসদ), ডাঃ সুদীপ্ত রায় (বিধায়ক), জয়শ্রী টেক্সটাইলস-এর ম্যানেজার জে. সি. সোনি, ডেপুটি ম্যানেজার ডঃ এ. কে. সিন্‌হা, ডঃ প্রীতিমাধব রায়, জয়দেব নাগ, তপন নাগ এবং রিষড়া পৌরসভার কাউন্সিলারবৃন্দ সহ স্থানীয় চিকিৎসকরা।

পরম্পরা

গীতায় কর্ম করার উপদেশ

শ্রীমৎ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান কর্ম ত্যাগের উপদেশ করেননি, উপদেশ করেছেন, তুমি নিয়মিত ভাবে কর্ম করে যাও, 'কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মনঃ'—কর্ম না করা অপেক্ষা কর্ম করাই শ্রেয়ঃ। শুধু তাই নয়, কর্মহীন হলে তোমার দেহযাত্রাও নির্বাহ হবে না। মানুষকে কর্মে প্রচোদিত করার জন্য শ্রীভগবানের যে উদাত্ত আহ্বান তা আজ পাঁচ হাজার বছর ধরে বিশ্ববাসীকে প্রেরণা জুগিয়ে আসছে। পদ্মের এক একটি পাপড়িকে ক্রমে ক্রমে প্রসারিত করলে যেমন পরিশেষে তেমনই শ্রীভগবান গীতায় অপূর্ব বাচনভঙ্গীর মাধ্যমে ধীরে ধীরে কর্মের রহস্যটি উন্মোচিত করেছেন সমাজ, রাষ্ট্র এবং ব্যক্তি জীবনের কল্যাণের জন্য।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে।৩/৬

—যে মূঢ় ব্যক্তি হস্ত, পদ, বাক্য উপস্থ ও পায়ু প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে অর্থাৎ কর্মের মধ্যে যুক্ত না করে মনে মনে গ্রহণ, গমন বা শব্দরসাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ স্মরণপূর্বক অবস্থান করেন তাঁকে মিথ্যাচারী বলা হয়। যাঁরা কর্মযোগ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাবশত অথবা অলস প্রকৃতির জন্য হস্তপদাদির দ্বারা কোন কর্ম না করে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেন অথচ ইন্দ্রিয় সম্পর্কিত বিষয়সমূহ মনে মনে স্মরণ করেন বা ভোগ করেন তাঁদের বিশেষভাবে ভগবান নিন্দা করেছেন। ভগবান তাঁদের তিরস্কার করে বিশেষরূপে মূঢ় বলেছেন আবার মিথ্যাচারী বলেছেন। কর্মেন্দ্রিয়গুলির ব্যবহারের মধ্যেই রয়েছে শরীরের মধ্যে তাদের অবস্থানের স্বার্থকতা।

কিন্তু কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কিভাবে কর্ম করতে হবে সেই রহস্যটি অবগত হওয়া প্রয়োজন। ভগবান বলেছেন, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক প্রভৃতি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে অনাসক্তভাবে কর্মেন্দ্রিয়গুলির দ্বারা কর্ম করতে হবে (গীতা ৩/৭)। জ্ঞানেন্দ্রিয়র কাজ বিষয় গ্রহণ আর কর্মেন্দ্রিয়র কাজ কর্ম করা। ওই দু-প্রকার ইন্দ্রিয়রই জীবনে সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন। চক্ষু রূপ দর্শন করে, কর্ণ শব্দ শ্রবণ করে, নাসিকা গন্ধ আঘ্রাণ করে, জিহ্বা খাদ্যদ্রব্যাদির রস আস্বাদন করে, ত্বক্ স্পর্শ সুখ অনুভব করে। এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও আস্বাদন করে, ত্বক্ স্পর্শ সুখ অনুভব করে। এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ প্রভৃতি বিষয় ভোগ করে থাকি। জগতে যত প্রকার বিষয় আছে তা ওই পাঁচটির মধ্যে বিধৃত আছে। তাই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়কে যদি সংযত করা না যায় তা হলে কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা যত শুভ কাজই করা হোক না কেন তা পরিণামে জীবনকে পূর্ণ করবে না। সংযমের অর্থ ইন্দ্রিয়গুলিকে কল্যাণের পথে ঈশ্বরীয় পথে পরিচালিত করা। দেখতে হবে চোখ যেন স্নিগ্ধ সুন্দর মঙ্গলময় রূপ দর্শন করে, কান যেন ভগবৎ বিষয়ক, সমাজকল্যাণমূলক শব্দ শ্রবণ করে, নাসিকা যেন স্নিগ্ধ প্রাণমাতানো মিষ্ট গন্ধ আঘ্রাণ করে, জিহ্বা যেন সাত্ত্বিক আহার, ভগবানের প্রসাদাদি গ্রহণ করে এবং ত্বক্ যেন মনের আনন্দবর্ধক কোমল স্পর্শ অনুভব করে।

জ্ঞানেন্দ্রিয় সংযত হলে মন ও বুদ্ধি মার্জিত হয়, তখন সেই মার্জিত মন-বুদ্ধি দ্বারা কোন অন্যায় কাজ করা সম্ভব হয় না। তাই ভগবান বললেন জ্ঞানেন্দ্রিয় সংযত করে তুমি কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা সমস্ত কার্য নির্বাহ কর। এই কার্যও অনাসক্ত হয়ে করতে বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ। গীতায় কর্ম ত্যাগের করা যেমন ভগবান বলেননি তেমনই আবার অনাসক্ত হয়ে কর্ম করা হয়। ঈশ্বরের দ্বারা নিয়োজিত হয়ে কর্ম করছি, ঈশ্বরের প্রীতির জন্য কর্ম করছি এবং কর্মের ভালমন্দ ফল ঈশ্বরকেই অর্পণ করতে হবে এই চিন্তা ভাবনা নিয়ে যদি কাজ করা যায় তাহলে কর্মের দ্বারা কোন বন্ধন হয় না। তাই ভগবান বললেন, 'যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ (৩/৯) —যজ্ঞের জন্য বা ঈশ্বরার্থে অনুষ্ঠিত কর্ম ব্যতীত অন্য কর্ম বন্ধনের কারণ হয়। স্মৃতিতেও আছে—'কর্মনা বধ্যতে জন্তুরিতি স্মৃতি' কর্ম দ্বারা প্রাণী বদ্ধ হয়। যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ—বিষ্ণুই যজ্ঞ স্বরূপ। তাই ভগবানের উদ্দেশ্যে কর্ম করলে সেটি যজ্ঞ হয়ে যায়,

জ্যোতিসরে প্রতিষ্ঠিত গীতা-উপদেশ মূর্তি

তখন সেই কর্ম বা কর্মফল আর আমাদের বন্ধনের কারণ হয় না।

'শিবমানসপূজন' স্তোত্রে বলা হয়েছে—

সঞ্চারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণবিধিঃ
স্তোত্রাণি সর্বাগিরো
যদ্ যদ্ কর্ম করোমি তত্তদ্খিলং শম্ভো
তবারাধনম্।।

—হে শম্ভো, আমার পদসঞ্চারণ ভ্রমণাদি যেন তোমাকে প্রদক্ষিণ করা, আমার সকল বাক্যই তোমার যেন স্তোত্রাবলী এবং যা যা কাজ করি সবই তোমার আরাধনা। সাধক রামপ্রসাদের গানে আছে—'আহার করি যেন আহুতি দিই শ্যামা মাকে। অর্থাৎ ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম করতে হবে। কি ভাবে করতে হবে? পদ্ধতি কি? ভগবান বললেন—'তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর' (৩/৯)—হে কৌন্তেয়, কর্ম সম্যক্রূপে অনুষ্ঠান কর (কর্ম সমাচর), কিন্তু 'তদর্থং' তাঁর নিমিত্ত বা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কর্মের অনুষ্ঠান কর এবং 'মুক্ত সঙ্গঃ'—কর্ম ও কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ করে কর্মানুষ্ঠান কর। দুটি শব্দ ভগবান ব্যবহার করেছেন—তদর্থং এবং মুক্তসঙ্গঃ। কর্মযোগ সাধনার মূল রহস্যটি যেন ঐ দুটি শব্দের মধ্যে দিয়ে ভগবান তুলে ধরেছেন। কর্ম যদি নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য করা হয় এবং কর্মফলের প্রতি আসক্তিযুক্ত হয়ে করা হয় তাহলে তা বন্ধনের কারণ হবে—আসা-যাওয়ার চক্র কোনদিনই বন্ধ হবে না, আর যদি সেই একই কর্ম ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে করা হয় এবং আসক্তিশূন্য হয়ে করা হয় তাহলে তা জীবের মুক্তির কারণ হয়। ঐরূপভাবে কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্তশুদ্ধি হলে স্বরূপানুভূতি হয়। আর স্বরূপানুভূতি হলে মুক্তি হয় করতলগত।

যমুনায় উত্তাল তরঙ্গ, গোপীরা যমুনা পার হয়ে মথুরার হাটে যাবেন। ব্যাসদেব যমুনার তীরে অবস্থান করছিলেন। গোপীরা তাঁর কাছে যমুমনাকে শান্ত করার জন্য প্রার্থনা জানালেন। ব্যাসদেব বললেন, এখন আমার ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে, তাই আগে খাবার দাও পরে কথা হবে। গোপীরা প্রচুর ক্ষীর, ননী খাওয়ালেন। তখন ব্যাসদেব যমুনার কাছে গিয়ে বললেন, হে যমুনে, আমি আজ যদি কিছু না আহার করে থাকি তাহলে তোমার জল শান্ত হয়ে যাক্। যমুনা শান্তরূপ ধারণ করল। গোপীরা তো অবাক! বললেন—ঠাকুর, তুমি এত ক্ষীর, ননী খেলে আর বললে যে, কিছুই খাওনি। ব্যাসদেব বললেন, সত্যই তো আমি কিছু খাইনি, আহার করেছেন তো বৈশ্বানর। অগ্নিরূপ ক্রিয়াটিও কিভাবে সমর্পণ করতে হয় তার অপূর্ব শিক্ষা।

আশ্রম মঠে সাধু-সন্ন্যাসীরা দেখা যায় সংসারী মানুষের থেকেও বেশী কাজ করেন। সমাজকল্যাণ মূলক এবং আশ্রম পরিচালনার জন্য বহু কাজেই তাঁদের করতে হয়। অর্থ সংগ্রহ, জাগতিক বস্তু সংগ্রহ এবং গৃহাদি নির্মাণ প্রভৃতি সব কিছুই করতে হয়। কিন্তু তাঁরা অর্থ সংগ্রহ থেকে গৃহাদি নির্মাণ পর্যন্ত সমস্ত কাজই শ্রীগুরুদেবের কাজ, ভগবানের কাজ হিসাবেই করেন। সকল কাজকেই তাঁরা ঈশ্বরের উপাসনা বলে গ্রহণ করেন। সেই কর্ম তখন আর সাধারণ কর্ম থাকে না, তা হয়ে যায় কর্মযোগ। তাই ভগবান বললেন—

ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে
কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোহভি জানাতি
কর্মভির্ন স বধ্যতে॥ ৪/১৪

অর্থাৎ কর্মসমূহ আমাকে স্পর্শ করে না, আমি নির্লিপ্তভাবে কর্ম করে যাই আর কর্মফলেও আমার আকাঙ্ক্ষা নেই। এইভাবে যিনি আমাকে জানতে পারেন তিনি কর্মসমূহের দ্বারা কখনই বদ্ধ হন না। অর্থাৎ ভগবান যেভাবে নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করেন প্রভূত কর্ম করেও, আমাদের সেইভাবে অহংকার শূন্য হয়ে কর্ম করার অভ্যাস করতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামচন্দ্রের জীবন যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে দেখা যাবে—পূজা-উপাসনা থেকে আরম্ভ করে রাজকার্য্য পরিচালনা ও যুদ্ধ বিগ্রহ দ্বারা দেশ ও ধর্মরক্ষার কার্য পর্যন্ত প্রবল কর্মব্যস্ততার মধ্যে তাঁদের জীবন কেটেছে। আবার ভগবান বুদ্ধ, আচার্য শংকর, চৈতন্য মহাপ্রভু, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতির জীবন পর্যালোচনা করলেও দেখা যায় সাধন ভজনের উৎকর্ষতার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মপ্রচার ও ধর্মরক্ষার কাজে তাঁরা করেছিলেন জীবন উৎসর্গ। প্রবল কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তাঁরা থাকতেন শান্ত সমাহিত। কর্মযোগের সাধনার জন্য তাই তাঁদের জীবন অনুধ্যান করা প্রয়োজন।

সেই সঙ্গে প্রয়োজন বিচার এবং অভ্যাস। তাহলে আমরাও একদিন হয়তো উপলব্ধি করতে পারব প্রবল কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে মরুভূমির নিস্তব্ধতা।

ভগবান লহেন ভক্তের সর্বদায়ভার

অনন্যশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।।
গীতা ৯/২২

ঈশ্বর অনুরক্তি যাঁদের তীব্র, ভগবানে সর্বোতভাবে সমর্পিত যাঁরা, তাঁরা বিরাজ করেন তাঁর নিরবিচ্ছিন্ন কৃপাবলয়ে। কোন কল্পবিলাস বা কথার কথা নয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী বাহিত বহু ঘটনা বিষয়টিকে প্রত্যয়িত করেছে।

নিজেও প্রত্যক্ষ করেছি ভগবান হৃষীকেশের মুখনিঃসৃত আশ্বাসবাণীর সত্যতাকে।

১৯৯৩-এ অক্ষয় তৃতীয়ার সময় শ্রীক্ষেত্রে ভগবান শ্রীহরির এক পরমভক্ত সন্তপুরুষের দর্শন লাভ করি অপ্রত্যাশিতভাবে। থাকতেন তিনি পুরীর বালিয়া পন্ডা এলাকায়। একটি জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে। জায়গাটি নাতি উচ্চ বালির পাহাড়ে ঘেরা। তাকে ঘিরে নারকেল গাছের সারি। বালিয়ারীর মধ্যখানে কাজুর জঙ্গল। অবাধ গতি বিষাক্ত সরীসৃপ, কীটপতঙ্গ ও গোসাপদের। বনের মাঝ বরাবর একটি অতি জীর্ণ পুরানো বাড়ি। তারই মধ্যে নিশ্চিন্ত হৃদয়ে বাস করছেন শতবর্ষ উত্তীর্ণ এক বৈষ্ণব মহাত্মা। স্থানীয় পরিচিতি-বালিয়া বাবা। সন্ত পরিচয় নটবর ব্রহ্মচারী মহারাজ।

সোমনাথ নন্দী

রামানুজী বা শ্রীবৈষ্ণবমার্গী।

শীর্ণকায় অথচ জ্যোতির্দীপ্তশরীর বয়সভারে ন্যুব্জ। সারা অবয়ব জুড়ে আনন্দের অপূর্ব নিঃসরণ। সদাহাস্যময়। অথচ প্রবল ব্যক্তিত্বের আভাস।

সন্ত বালিয়া বাবা

খড়দার বলরাম ধর্মসোপানের অধ্যক্ষ নৃসিংহ রামানুজ দাস মহারাজের সংবাদের সূত্র ধরে পৌঁছানো বালিয়াবাবার কাছে। সঙ্গে নিয়েছিলাম চাল-আটা-ফল ইত্যাদি আহার্য বস্তু তাঁর দেবসেবার সামগ্রী হিসাবে, নৃসিংহজীর উপদেশ অনুসারে।

সামগ্রীগুলি সযত্নে ভিতর ঘরের মধ্যে তুলে রেখে বললেন, আজ তোমার দান অক্ষয় হয়ে রইল। তারপর শ্রীমদভাগবতের বহু বিষয় আলোচনা করতে লাগলেন।

অঞ্চল সূত্রে জেনেছিলাম বাবা দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরে জঙ্গলের জায়গা ছেড়ে বাইরে বেরোননি কখনও। কিভাবে তাঁর শরীর নির্বাহ হয় কেউ সঠিক বলতে পারেননি। এ বিষয়ে বাবাকে একদিন জিজ্ঞাসা করাতে বলেছিলেন—বেটা, জগন্নাথদেবের কৃপায় কোনদিন অভুক্ত থাকতে হয়নি। তিনি মন্দিরে ভোগগ্রহণ করেন আর এখানে দুই ভাইয়ে লীলা করেন। আর আমার কাছে আটার লাড্ডু খাওয়ার জন্য জিদ ধরেন মাঝে মাঝে। তবে হ্যাঁ। মাঝে মাঝে তাঁর ইচ্ছায় অভুক্ত অবস্থা আসে। সে সময় প্রভুর প্রসাদী তুলসী ও কাজু গাছের পাতা খেয়ে কাটাতে হয়। কিছুদিন হল সে অবস্থা গেছে। এখন তোমাদের মতো কাউকে দিয়ে তিনি প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাঠিয়ে দেন এই দুর্গম জায়গায়।

এরপর প্রতি মাসে আমার কার্যোপলক্ষে ভুবনেশ্বর যেতে হত।

(এরপর ১৩ পাতায়)

মাতৃজাতির প্রতি অত্যাচার-প্রতিরোধে আইন

অরুণা মুখোপাধ্যায়

উল্টোডাঙ্গায় সেদিন হইহই কাণ্ড। কারণটা কি? না, এক যুবতী দাঁড়িয়েছিল বাস ধরবে বলে। হঠাৎই দু'তিনজন যুবক তাকে জোর করে অটোয় তুলে পালাতে চেষ্টা করছিল। আবার, আমাদের পাড়ায় সেদিন পাশের বাড়ির নমিতা-বৌদিকে বলাৎকার করে তারই এক আত্মীয়। আজও নমিতা-বৌদি চিকিৎসাধীন। এ ধরনের ঘটনা এখন অহরহ ঘটছে জনবহুল এলাকায় দিনদুপুরে। যতই মানুষ শিক্ষিত হচ্ছে, ততই যেন মানসিকতার অধঃপতন ঘটছে। এর বিহিত চায় এখনকার স্বাধীনচেতা শিক্ষিতা মহিলারা। মহিলাদের প্রতি বলপূর্বক এইসব অত্যাচার কি কোনওভাবে বন্ধ করা যাবে না? এই সব অপরাধীদের উপযুক্ত শাস্তি কোথায়!

নারী প্রগতির যুগে নারীর উপর আজও অনৈতিক অত্যাচার চলে আসছে নানাভাবে। মহিলাদের ক্ষোভ উত্তাল হয়ে ওঠার মুখেই তাদের কাছে সাধারণভাবে এসে পৌঁছয় এক সুখবর। সেটি হলো, এরই প্রতিকারার্থে "The Immoral Traffic (Prevention) Act ১৯৫৬" পাশ হয়েছে। মহিলা ও কন্যাদের উপর আপত্তিকর নির্যাতন অর্থাৎ পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে যে সব অপরাধ করা হয়, সেই সব দমনের জন্যই কয়েকটি ধারার নতুনভাবে পরিবর্তন ঘটিয়ে ৪৬ স্মন্দ্র ১৯৭৮ রূপে ১৯৭৯ সালের ২রা অক্টোবর থেকে এই আইন Suppression of Immoral Traffic in women and Girls (Amendment) Act, ১৯৭৮ কার্যকরী হয়। ভারতের সর্বত্র এই আইনটি প্রযোজ্য। এই আইনের উল্লেখযোগ্য ধারাগুলি ৩, ৪, ৫, ৭, ৮, ১৫, ১৬ ইত্যাদি। ৩নং ধারায় বলা আছে, কোন ব্যক্তি আপত্তিকর কাজের জন্য ঘর রেখে দিলে অথবা ব্যবস্থাপনা করলে বা সহায়তা করলে তার শাস্তি হলো প্রথম বারের অপরাধের জন্য এক বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড, সেটি তিন বছরের বেশী হবে না ও ২০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা ও দ্বিতীয়বার অথবা পরবর্তী অপরাধের ক্ষেত্রে দু' বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড যেটি তিন বছরের বেশী হবে না এবং ২০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা। এই আইনের ৪ ধারার বিধানে ১৮ বছরের উর্দ্ধে কোনও ব্যক্তি জেনে শুনে পতিতাবৃত্তির আয় থেকে জীবনধারণ করলে তার শাস্তি হবে দু'বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা ১০০০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড। শিশু অথবা নাবালকের পতিতাবৃত্তির ক্ষেত্রে তার শাস্তি হলো সাত বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড যেটি ১০ বছরের অধিক হবে না। এই আইনের ৫ ধারার বিধানে এই জঘন্যতম অপরাধের জন্য নারী সংগ্রহকরণ ও প্রলুব্ধকরণ-এর ক্ষেত্রে এর শাস্তি হলো তিন বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড যেটি সাত বছরের বেশি হবে না ও ২০০০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা। এই কাজ ইচ্ছা-বিরুদ্ধ হয়ে থাকলে শাস্তি সাত বছরের কারাদণ্ড বেড়ে হবে ১৪ বছর। কোনও ব্যক্তির সম্মতি ছাড়া পতিতালয়ে আটক করা থাকলে তার শাস্তি হলো ৬ ধারার বিধানে সাত বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড যেটি যাবজ্জীবন অথবা দশ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড ও জরিমানাও হতে পারে। এই ধরনের আপত্তিকর ব্যবসা জনসাধারণের ক্ষেত্রে চালানোর বিষয়টি এই আইনের ৭ ধারায় উল্লেখ করে বলা আছে যে মন্দির, হোস্টেল ও হাসপাতাল থেকে (২০০ মিটারের মধ্যে হয়ে থাকলে যেগুলি নগরপাল অথবা নির্দিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা নির্দিষ্ট করা আছে) তবে সেই ক্ষেত্রে তার শাস্তি হলো তিনমাস কারাদণ্ড।

অনেক সময় রাস্তাঘাটে, জনবহুল রাস্তাতে এমনকী বাড়ির বিশেষ স্থানেও দণ্ডায়মান থেকে মেয়েদের প্রতি ছেলেরা অশালীন ভঙ্গি ও অঙ্গ-ভঙ্গির দ্বারা আপত্তিকর যৌনবৃত্তির ইঙ্গিত করেন। এই আইনের ৮ ধারায় এই সব অপরাধীর প্রথমবারের অপরাধের শাস্তি

হল কারাদণ্ড— এটি ছ'মাসের হতে পারে অথবা ৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয়দণ্ড। দ্বিতীয়বার অথবা পরবর্তীকালে অপরাধ করলে এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

এবার দেখা যাক, এসব অপরাধের তদন্ত কারা করবেন ও কিভাবে বিচার হবে।

এই আইনের ১৫ ধারায় বলা আছে যে যখনই পুলিশ আধিকারিক অথবা trafficking পুলিশ আধিকারিকের কোন যুক্তিপূর্ণ বিশ্বাস ঘটবে যে এই আইনের শাস্তিযোগ্য একটি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে অথবা হতে চলেছে কোন গৃহের ব্যক্তি সংক্রান্ত ক্ষেত্রে ও সেই গৃহের তদন্ত, পরোয়ানা সমেত করা যাবে না— দ্রুতগতিতে তখনই সেই পুলিশ আধিকারিক তাঁর তরফে কারণগুলি নথিভুক্ত করে ওই গৃহে পরোয়ানা ব্যতীত প্রবেশ করে তদন্ত করবেন। তবে এই তদন্তের আগে ওই পুলিশ আধিকারিক দুই বা ততোধিক সম্ভ্রান্ত বাসিন্দাদের ওই অঞ্চ ল থেকে ডেকে পাঠাবেন ও তাঁদের মধ্যে একজন নিশ্চি ত-ভাবে মহিলা হবেন। এরা সাক্ষী থাকবেন এই মর্মে একটি আদেশ লিখিত হবে। এই ধারাতে কোন ব্যক্তি সাক্ষী প্রদানে স্বীকৃত না হলে তিনি অপরাধী বলে বিবেচিত হবেন ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৭ ধারার বিধানে।

এরপরেই উপযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পতিতালয়ের ব্যক্তি প্রেরিত হবেন ও তাঁকে নিবন্ধকৃত চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করানো হবে। ওই ব্যক্তির বয়সের নির্দিষ্টকরণের জন্য ও যৌনসংসর্গের কোনও ক্ষতচিহ্ন প্রদর্শনের জন্য।

এই আইনের ১৬ ধারার বিধানে পুলিশের নিকট থেকে ম্যাজিস্ট্রেটের তথ্য সংগৃহীত হলে অর্থাৎ পতিতালয়ের ব্যক্তি অপরাধী তখন তিনি পুলিশ আধিকারিককে নির্দেশ দেবেন ওই পতিতালয়ে প্রবেশ করার জন্য ও ওই ব্যক্তিকে অপসারণ করে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করার জন্য। পুলিশ আধিকারিক এই আদেশ যথাযথ পালনে ব্যর্থ হলে তিনি তৎক্ষণাৎ নিকটবর্তী ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আদেশ প্রদানের জন্য তাঁকে উপস্থিত করবেন যিনি নিরাপদ জিম্মায় (Safe Custody) রাখার আদেশ প্রদান করবেন।

সমাজের স্বার্থে সংরক্ষিত গৃহ ও সংশোধনালয় রাজ্য সরকার তাঁর নিজস্ব বিধানমতো সৃষ্টি করতে পারেন ও প্রয়োজন অনুযায়ী এর চাহিদাও বর্ধিত হতে পারে।

তবে আইনজীবীর দৃষ্টিতে একটি কথাই বলবো যে জনকল্যাণমূলক আইনের প্রতিফলন ঘটানোর জন্য অবশ্যই প্রয়োজন জনজাগরণ ও সার্বিক শিক্ষা।

ভ্রম সংশোধন

গত ১৬ই নভেম্বর সংখ্যায় 'অঙ্গনা'র পৃষ্ঠায় 'ফেলে আসা একটি জীবন-নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়' শীর্ষক প্রতিবেদনে 'পদ্যগীতি'র পরিবর্তে 'পল্লীগীতি' এবং 'সিগারেটের ব্যবসা'র পরিবর্তে 'স্পিরিটের ব্যবসা' পড়তে হবে। একটি তথ্যগত ভুল—'বন্দিশ' ছবিতে উনি প্লে-ব্যাক করেননি। এই সকল অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।—স্বঃ সঃ

।। চিত্রকথা ।। চালাক কাক ।। ১

হুজি জঙ্গিদের নিশানায় বিজেপি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রাজ্য দপ্তর

কার্যালয়ের সামনে ২৪ ঘন্টা পুলিশ পাহারা।

নিজস্ব প্রতিনিধি।। জঙ্গি নিশানায় এবার কলকাতার ভি এইচ পি অফিস (৩৩, ভূপেন বোস অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০০৪) ও বিজেপি অফিস (৬, মুরলীধর সেন লেন, কলকাতা-৭)। গত ১০ই নভেম্বর স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের কর্তারা তিন হুজি জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেন। ঠিক তার পরের দিন অর্থাৎ ১৮ই নভেম্বর গ্রেপ্তার করা হয় ওই তিন জঙ্গির এক লিংকম্যান মহম্মদ আশরাফুলকে। এদের কাছ থেকে বিস্ফোরণ ঘটানোর উপযুক্ত রাসায়নিক ও ডিটোনেটরও পাওয়া গিয়েছে। জেরার মুখে জঙ্গিরা স্বীকার করে নিয়েছে যে কলকাতার ভি এইচ পি অফিস, বিজেপি অফিস ও শিয়ালদহ স্টেশনে হামলা চালানোর পরিকল্পনা নিয়েই তারা কলকাতায় ঢুকেছিল। ইতিপূর্বে এপ্রিল মাসে ভোটের সময়েও বিজেপি ও ভি এইচ পি অফিসে হামলার পরিকল্পনা নিলেও অতিরিক্ত পুলিশি কড়াকড়ি থাকায় তারা বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি বলে ওই তিন জঙ্গি জেরার মুখে স্বীকার করে নিয়েছে। তখন থেকেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যালয়ে চবিবশ ঘন্টা পুলিশ প্রহরার বন্দোবস্ত হয়। জঙ্গিদের কাছ থেকে ৩০ লক্ষ টাকার জাল নোটও উদ্ধার করেছে এস টি এফ। তদন্তে জানা গেছে, বাংলাদেশের একসময়ের প্রথম সারির হুজি জঙ্গি শাহিদ বিলালের সঙ্গে এদের যোগসাজশ ছিল। এরাই শ্রমজীবী এক্সপ্রেসে বিস্ফোরণ ও হায়দরাবাদে আত্মঘাতী হামলার সঙ্গে যুক্ত বলে পুলিশের অনুমান। এদিকে বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাহুল সিন্‌হা বলেছেন, নিরাপত্তার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। আমরা কিছু দাবী করব না। অঘটন ঘটলে রাজ্য সরকারকেই তার দায় বহন করতে হবে।

জঙ্গিদের নিরাপদ করিডর হয়ে উঠছে সুন্দরবন উপকূল

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার খাড়ি ও ছোট নদী ব্যবহার করে বাংলাদেশ থেকে জঙ্গিরা চলে আসছে ভারতে। ইদানীং সুন্দরবন সীমান্ত দিয়ে প্রতিদিন কয়েকশো গোরু পাচার হয়ে যাচ্ছে প্রতিবেশী দেশগুলোতে। বাসন্তীর চুনাখালি বাজার থেকে প্রচুর গোরু কেনা হচ্ছে গো-ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে। এরপর গোরুগুলোকে ট্রলারে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়ায়। শুধু এদেশ থেকে গোরু নিয়ে যাওয়া হয় না, পাচার করা হয় কিশোরী বালিকাদেরও। পাশাপাশি এদেশে আমদানি করা হয় যাবতীয় সুগন্ধি মশলা ও ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি। এই চোরাপথ দিয়ে কেবল পণ্য আমদানি হয় না, পাশাপাশি জঙ্গিদের নিরাপদ করিডর হয়ে উঠেছে সুন্দরবনের এই উপকূল অঞ্চল।

গোয়েন্দাসূত্রে জানা যাচ্ছে, বাংলাদেশের প্রধান পাঁচটি জেলার জঙ্গিরা নদীপথ পছন্দ করছে ভারতে ঢোকার জন্য। সাতক্ষীরা, খুলনা, পটুয়াখালি, বাঁকের হাট, কুমিল্লা জেলা থেকেও এপথে আসা পছন্দ করে জঙ্গিরা। মূলত ট্রলারে চড়ে এরা বাংলাদেশ থেকে রওনা হয়। সাগরদ্বীপের দিক থেকে আসার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে বড় ট্রলার আর খাড়ি দিয়ে আসার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে ছোট ট্রলার।

গোয়েন্দারা জানিয়েছেন উত্তর ২৪ পরগণার সীমান্তবর্তী হাকিমপুর, হিঙ্গলগঞ্জ, যোগেশগঞ্জ, আমলামেথি, নগেনবাদ, সন্দেশখালির শামসেরনগরের ২ নম্বর ও ৬ নম্বরই বেশি করে ব্যবহার করার চেষ্টা করে জঙ্গিরা। কিছুদিন পূর্বে অক্ষরধাম মন্দিরে জঙ্গি হামলার ঘটনায় দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর থেকে বাবুভাই নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে গুজরাট পুলিশ। এই বাবুভাই বাংলাদেশে প্রশিক্ষণ পাওয়া হুজি জঙ্গি সংগঠনের সদস্য বলে জানায় পুলিশ। তাকে জেরা করে পুলিশ জানতে পারে সুন্দরবনের জলপথ ব্যবহার করে তারা বাংলাদেশ ও

পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ করত। গোয়েন্দাদের মতে দক্ষিণ ২৪ পরগণার কয়েকটি জায়গা বেশি করে ব্যবহার করছে জঙ্গিরা। গোসাবা অঞ্চলের অন্তত দুটি সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ করা তুলনামূলক ভাবে সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোসাবার আমতলি ও ধুচনিখালির একদিকে ভারত অন্যদিকে বাংলাদেশ। মাঝখানে নদী। এসব চিন্তা করে অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান ঠেকাতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের উদ্যোগে গোসাবা থানার মোল্লাখালিতে তৈরি হয়েছে উপকূল থানা। যদিও পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে এই থানাতে। উপকূল থানা হওয়ার পর অবশ্য একটু সতর্ক হয়েছে জঙ্গিরা। তবে মানচিত্রের কিছু অদল বদল ঘটিয়ে অনুপ্রবেশ চলছে। চোরাকারবারও বন্ধ করা যাচ্ছে না। মোল্লাখালিতে উপকূল থানা গড়ে উঠায় ঝড়খালির ত্রিদ্বীপনগর হয়ে পাচার হচ্ছে গোরু। গত কয়েক মাস পূর্বে ৩২টি গোরু সহ চারজনকে ঝড়খালির মহিলারা তুলে দেন পুলিশের হাতে। পাথরপ্রতিমা এলাকার অম্বিকানগরের সোমবারের বাজার নামক জায়গাটিতে সপ্তাহে অন্তত একবার বাংলাদেশ থেকে ৪ বা ৫টি ট্রলার বেআইনি ভাবে মাছ নিয়ে আসে। মাছের ট্রলার বলে এদের কেউ বিশেষ সন্দেহ করে না কিন্তু গোয়েন্দারা তদন্ত করে দেখেছেন, অনেক সময়ই এইসব ট্রলার করে যতজন আসে, তাদের মধ্যে সবাই ফিরে যায় না। এই ট্রলারগুলি করেই মৎস্যজীবীদের সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গিরাও আসছে। এছাড়াও সাগরদ্বীপ হয়েও মাছ ধরার ট্রলারে করে জঙ্গিরা রাজ্যে আসছে বলে গোয়েন্দাদের অনুমান।

এরজন্য অনেক সময় যেমন সাগরদ্বীপ বা মুড়িগঙ্গাকে ব্যবহার করা হচ্ছে তেমন ব্যবহার করা হচ্ছে হাতানিয়া বা দোয়ানিয়া নদীকেও। নামখানায় মৎস্যজীবী সেজে একবার নামতে পারলেই সোজা ভারতের যেকোনও প্রান্তে পৌঁছে যাওয়া যায় সহজেই।

ভগবান লহেন ভক্তের সর্বদায়ভার

(১১ পাতার পর)

কলকাতা ফেরার সময় জগন্নাথদেব ও তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত বালিয়াবাবাকে দর্শন করতে ভুলতাম না। বাবার কাছে নিরন্তর যেতে যেতে তাঁর স্নেহের পাত্র হয়ে উঠেছিলাম। তিনি যেন আমার আনীত সেবাসামগ্রী (আহার্য বস্তু) বিশেষ পছন্দ করতেন আর শ্রীমদভাগবতের বহু প্রশ্নের উত্তর দিতেন সরল ব্যাখায়। পুরীর বহু পান্ডা ও সন্তের মুখে শুনেছি, বাবা চলমান ভাগবত, বহু সন্ত মহাত্মা সময়ে সময়ে তাঁর সাথে ভাগবত আলোচনায় আনন্দলাভ করতেন। এক সময়ে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর চারের দশকে তিনি জগন্নাথ মন্দিরে মহাপ্রভুকে ভাগবত শোনাতেন। শুনিয়েছেন প্রায় ২০ বছর। তারপর নীলাদ্রিনাথের আদেশে এই জঙ্গলাকীর্ণ জায়গায় আসা। নির্জনে ভজনের নিমিত্ত।

২০০০ সালের রথযাত্রার আটদিন পর অর্থাৎ বাহুড়া যাত্রার পরদিন তাঁর দর্শনে গেছি। আমার হাতে আটার লাড্ডুর আধখানা অংশ দিয়ে বললেন—বেটা খা লে। ইয়ে বলরামজী কা প্রত্যক্ষ প্রসাদ হ্যায়। তেরে লিয়ে রাখ দিয়া। তাঁর ভালবাসার কথা ভাবতে গেলে অশ্রু সংবরণ কঠিন হয়ে পড়ে।

এরপর শরীর ক্রমশ তাঁর ভাঙতে থাকে। ভাবতে থাকি তাঁর সেবক তো কেউ নেই। শিষ্যও নেই। এমতাবস্থায় কে তাঁর সেবা করবে।

জুলাই মাস ২০০২ সাল। বাবার দর্শনে গিয়ে দেখি তিনি আরক্ত দুর্বল হয়ে পড়েছেন। নড়াচড়ার শক্তিও কমে গেছে। আশ্চর্য হলাম দেখে মধুসূদনদাস বাবাজী নামে এক গৌড়ীয় সাধু তাঁর সেবার ভার তুলে নিয়েছেন। সাথে আছেন আরও জনা তিন ব্রহ্মচারী। বাবার কাছে ভাগবত শিক্ষা করছেন। তাঁরাও সেবা করছেন বাবার। তবে মুখ্য সেবক মধুসূদনদাস বাবাজী। বাবা যখন ২০০৪ সাল থেকে শয্যাশায়ী মধুসূদন বাবাজী অক্লান্তভাবে বাবার সেবা করে গেছেন। কতবার ভেবেছি এই মধুসূদন বাবাজীর কথা। কিভাবে তিনি পড়ে আছেন বাবার এই বিপদসঙ্কুল স্থানে। কিজন্য তাঁর সেবা করছেন। কি পাচ্ছেন তিনি?

মধুসূদন বাবাজীকে এবিষয়ে একদিন জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর দিয়েছিলেন চৈতন্য-চরিতামৃতের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে—এক ভাগবত হয় ভাগবত শাস্ত্র/আর ভাগবত—ভক্তিরসপাত্র। বাবা যেমন চলমান ভাগবত, তেমনি উত্তম ভগবদভক্ত। বলে তিনি ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের একটি শ্লোকের অর্থ উপমারূপে দিলেন—যে হরির নাম অবশ্যভাবে বললেও পাপ দূর হয়, উত্তম ভক্ত তাঁর চরণদ্বয় নিজের হৃদয়ে প্রেমরজ্জু দিয়ে বেঁধে রাখেন। তিনি তাঁকে ত্যাগ করেন কিভাবে। জানবেন বাবা আমার কাছে তাই। স্বয়ং মহাপ্রভু জগন্নাথ তাঁর হৃদয়ে নিত্য বিরাজিত। তাঁর সেবা সচল জগন্নাথের সেবা।

মধুসূদন বাবাজীর উপলব্ধির সাথে আমিও সহমত। বাবার ভার যে নীলাচলনাথ বইছেন এতে সন্দেহ নেই। নাহলে, তাঁর চলঃশক্তিহীন শরীরকে সেবার জন্য কেন আসবেন মধুসূদন বাবাজী। কেন বাবার সেবার অর্থ যোগাবেন কটকের নই সড়কের মাড়োয়ারী ভক্ত।

বাবার ২০০৫-এর ১১জুন দেহাবসানের পর আর দেখা যায়নি মধুসূদন বাবাজীকে। পুরীর বিভিন্ন মন্দিরে অনুসন্ধান করেও হদিশ পাইনি তাঁর। প্রশ্ন তাই থেকে গেছে বাবার সেবক কে এই মধুসূদন!

প্রতিমা ভাঙার দায়ে যাবজ্জীবন

বিশেষ সংবাদদাতা, বীরভূম ঃ মুসলিম দুষ্কৃতীদের দ্বারা ভাঙচুর হয় দুর্গা প্রতিমা। দেবীপ্রতিমার উপর হামলা রুখতে নিয়ে খুন হন এক ব্যক্তি। এই ঘটনায় যুক্ত থাকায় ৯ জনের যাবজীবন কারাদণ্ড হল। সম্প্রতি রামপুরহাট মহকুমা আদালতের ফাস্ট ট্র্যাক থার্ড কোর্টের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক অনিমেষ চক্রবর্তী এই রায় দেন।

আদালতসূত্রে জানা গেছে, ২০০৭ সালের ২২ অক্টোবর মুরারই থানার রুদ্রনগর গ্রামে রাজবংশী পাড়ার দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের জন্য শোভাযাত্রা বের হয়। সেইসময় আচমকাই একদল মুসলমান দুষ্কৃতী সশস্ত্র অবস্থায় হামলা চালায়। ভাঙচুর করা হয় দুর্গা প্রতিমা। বিসর্জনের শোভাযাত্রায় থাকা ওই গ্রামের বাসিন্দা ভবেশ ভুঁইমালি বাধা দেয় দুষ্কৃতীদের। মুসলিম দুষ্কৃতীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করায় ভবেশ ভুঁইমালি মারা যায়। আহত হয় সাপলু কোনাই, তুলসী, রবিদাস, সুভাষ কোনাই। বিনোদ রাজবংশী, প্রভাত রাজবংশী ও পিকু রাজবংশী। তাদের প্রত্যেককেই রামপুরহাট মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শোভাযাত্রায় হামলার খবর পেয়ে পুলিশ রুদ্রনগর গ্রামে গেলে গ্রামবাসী চন্দন রাজবংশী ১৪ জন দুষ্কৃতীর নামে অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা শুরু হয়।

এই মামলার সরকারি আইনজীবী হিরণ শঙ্কর সিংহ বলেন, ১৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা হলেও এদিন ৯ জনের বিচার হয়। বাকি ৫ জন আসামী এখনও পলাতক। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮, ৩২৪, ৪২৭, ১৫৩/এ, ৩০২ ও ১৪৯ ধারায় ৯ জনকেই বিচারক যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। জরিমানা অনাহারে আরও এক বছর করে জেল। সাজাপ্রাপ্ত আসামীরা রুদ্রনগরের বাসিন্দা, খুরসেদ শেখ, কুদরত শেখ, হোসেন শেখ, হাসমত শেখ, সোবরাতি শেখ, দিলীপ শেখ, আনন্দ শেখ, বিল্লি শেখ, ও ধনিক শেখ, এই নয় জন দুষ্কৃতী প্রতিমা বিসর্জনের সময় দুর্গা মূর্তির উপর হামলা চালায়। হামলা রুখতে গেলে ভবেশ খুন হয়।

বিজয়া ও দীপাবলী সম্মেলন

সন্ধ্যা ৬-১৫ মি.। ২৫ অক্টোবর ২০০৯, রবিবার। বেহালা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সুসজ্জিত প্রাঙ্গণ। স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতির সামনে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করলেন নিউ আলিপুর শ্রীশ্রীসারদা আশ্রমের মাতাজী প্রব্রাজিকা দেবপ্রাণা। বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্রের বিজয়া ও দীপাবলী সম্মেলের শুভ সূচনা হল। দুর্গাস্তোত্র, নৃত্য, গীত, আবৃত্তি, যন্ত্রসংগীত ছাড়াও ছিল সংস্কার-ভারতী-বেহালা শাখার গীতি-আলেখ্য। 'দুর্গা সাজো' প্রতিযোগিতায় 'শিশুদুর্গা'দের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানস্থলে অসুর শক্তির বিরুদ্ধে দৈবশক্তির বিজয় ঘোষণা করছিল। গানের অন্তাক্ষরী প্রতিযোগিতা এবং দুর্গাপুজো ও কালীপুজো বিষয়ে 'ক্যুইজ' ছিল অনুষ্ঠানের উপরি পাওনা। পূজনীয় মাতাজী তাঁর অসাধারণ আশীর্বচনে বললেন যে, এই অনুষ্ঠানের আয়োজক ও উপস্থিত অনুরাগীবৃন্দ যাঁরা হাজারো সাংসারিক বাধা-বিপত্তি ও কর্মব্যস্ততার মধ্যেও এত সুন্দর ভাবমণ্ডিত একটি অনুষ্ঠানে সমবেত হয়েছেন তারা ধন্যবাদার্হ। এই কথাটি যেন সবার হৃদয়কে ছুঁয়ে গেল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন থ.ত্ব.গু.ট্র.-এর বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ প্রসাদ এবং অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়। সাধারণ সম্পাদকের ভাষণে অলোক বরণ চট্টোপাধ্যায় পাঠচক্রের অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। বিশিষ্ট সমাজসেবী ও লেখক শক্তিশেখর দাস মহাশয় তাঁর ভাষণে এই বছরের দুটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করেন। যথা—আচার্য জগদীশচন্দ্রের জন্মের ১৫০ বছর পূর্তি এবং শ্রীঅরবিন্দের উত্তরপাড়া অভিভাষণের ১০০ বছর পূর্তি। স্বপন ঘোষ মহাশয় উপস্থিত ২০০ জনকেই মিষ্টিমুখ করান।

ভারতীয় হকিতে আশান্তির বাতাবরণ

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।। দুর্ভাগ্য যেন পিছু ছাড়ছে না ভারতীয় হকির। সেই কবে থেকে দুর্ভাগ্য তাড়া করে বেড়াচ্ছে হকি সমাজকে। যে হকির জন্য বিশ্ব দরবারে ভারতের এত গৌরব, প্রভাব-প্রতিপত্তি, আজ সেই হকিই ভারতবর্ষের স্বপ্ন ও আশা- ভঙ্গের কারণ। ভাবা হয়েছিল

বিদেশী কোচের হাতে পড়ে হয়ত রাহুর দশা কাটবে, অন্ধকার কেটে আলোর রোশনাইয়ে ঝলমল করে উঠবে ভারতীয় হকি। সেই আশাও বোধহয় অলীক-কুসুম। জোস ব্রাসাই এখন হকি কর্তাদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছেন।

একবছর আগে অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে বিশ্বের অন্যতম সেরা ট্যাকটিকাল কোচ স্পেনের জোস ব্রাসাকে নিয়ে আসা হয়েছিল। আন্তর্জাতিক হকি সংস্থাই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নবগঠিত 'হকি ইন্ডিয়া' কর্মকর্তাদের কাছে তার নাম প্রস্তাব করে। আসলে ভারতীয় হকিকে টেনে তুলতে এদেশের হকি কর্তা, ক্রীড়ামন্ত্রক, মিডিয়া— কারুর কোনও দায় নেই। কিন্তু আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্তারা জানেন, বোঝেন মৃতপ্রায় ভারতীয় হকির বাজার দর। বিশ্বের যে প্রান্তেই খেলুক না কেন ভারত, দর্শক মাঠে আসবে শিল্পের টানে। ভারত-পাকিস্তান হকি মানেই ক্লাসিক্যাল ঘরানার রোমান্টিক, রোমাঞ্চ কর আবেগ।

তাই ফুটবলে ফিফার কাছে যেমন বাড়তি সমাদর পায় ব্রাজিল, তেমনি বিশ্ব হকির নিয়ামকদের কাছে ভারতের গুরত্ব। যতই ব্যর্থতা ও হতাশাজনক পারফরমেন্সে মলিন হোক না ভারতীয় হকির সাম্প্রতিক ও নিকট অতীতের ক্রীড়ানৈপুণ্য। সেজন্যই ব্রাসার নাম প্রস্তাব ও সাগ্রহে হকি ইন্ডিয়ার তা অনুমোদন। আর ভবিষ্যতের জন্য স্বপ্নের জাল বোনার শুরু তার ভারতে আসার পরদিন থেকেই। তার কোচিংয়ে বড়মানের কোনও টুর্নামেন্ট এখনও খেলেনি ভারত। দু-তিনটি দেশের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ দিয়ে কিছুই বোঝা যায় না।

ব্রাসার আসল পরীক্ষা আগামী মার্চের

জোস ব্রাসা

বিশ্বকাপ হকি। দিল্লীতে বসতে চলেছে এই আসর। তারজন্য জোর কদমে প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গেছে। আর সেই শিবিরেই জমতে শুরু করে অশান্তির কালো মেঘ। পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয়ে উঠেছে যে কতিপয় খেলোয়ার শিবির ছেড়ে চলে যেতে চাইছে। কারণ ব্রাসা নিরপেক্ষ নন, বিশেষ কয়েকজনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করছেন আর বাকিদের গুরুত্বহীন করে রেখেছেন। দলের মধ্যে উপদল গড়ে তুলেছেন, অপছন্দের খেলোয়াড়দের সুযোগ থেকেই অসম্মান করছেন।

ব্রাসার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ জাতীয় দলনেতার কাছ থেকে সন্দীপ সিংকে সরিয়ে দেওয়া। বিশ্বপর্যায়ের ডিফেন্ডার সন্দীপ যে নেতৃত্বের চাপেও নিজের স্বাভাবিক খেলা ধরে রাখতে সক্ষম, তার প্রমাণ সাম্প্রতিক ইউরোপের তিন সফর তারপর এদেশের মাটিতে অনুষ্ঠিত টেস্ট সিরিজেও তার পারফরমেন্স ও নেতৃত্বের মধ্যে চমৎকার ভারসাম্য ছিল। সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন তরুণ তুর্কী সন্দীপ। রক্ষণ সামলাবার পাশাপাশি শর্টকর্ণার থেকেও গোল তুলে আনেন। তার ওপর ব্রাসার এই অন্যায় আচরণ মেনে নিতে পারছেন না কেউ।

ব্রাসার এরকম আরও কিছু তুঘলকী আচরণে সিনিয়র প্রবোধ টিরকে, ইগনেসিয়াস টিরকে, অর্জুন জলাপ্পারা এতটাই ক্ষিপ্ত যে শিবির লাটে ওঠার জোগাড়। হকি ইন্ডিয়ার নির্বাচক ও কর্তারা দু'তরফের মধ্যে বোঝাপড়া করে সমাধান সূত্র একটা বের করেছেন বটে, তবে ক্ষোভের আগুন তাতে প্রশমিত হবে কিনা সংশয় রয়েছে। ব্রাসা নাকি সহকারী কোচ ও ট্রেনারদেরও গুরুত্ব দেন না। সহকারী কোচ হরেন্দ্র সিং মনে করেন ব্রাসা যেহেতু আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রেরিত কোচ, তাই নিজেকে কেউকেটা ভাবেন। তার সব কাজই মেনে নেবেন হকি ইন্ডিয়া।

হকি ইন্ডিয়া যতই নড়বড়ে অবস্থায় থাকুক, তারা কিন্তু এ ঘটনায় নড়েচড়ে বসেছেন ও চটজলদি ব্যবস্থা নিয়েছেন। কিন্তু চাপা টেনশনের চোরাস্রোত বিরাজ করছে ভারতীয় হকি শিবিরে। ২০১০—বিশ্ব হকির পক্ষে ঘটনাবহুল বছর। বিশ্বকাপ হকি, কমনওয়েলথ গেমস রয়েছে। আর রয়েছে এশিয়াড। ভারতের কাছে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বছরটি। দু'দশকের খরা কাটিয়ে সাফল্য ও গরিমায় আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে ভারতীয় হকি, সেই উদ্দেশ্যেই ব্রাসাকে আনা। সাহারা ইন্ডিয়া স্পনসরশিপও অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছেন। কেপিএস গিলের অপশাসন শেষ করে আন্তর্জাতিক হকি সংস্থার অনুমোদন সাপেক্ষে হকি ইন্ডিয়া গঠিত হয়েছে। পাঁচ প্রাক্তন তারকা অলিম্পিয়ান এবং আই ও এ তথা কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক নিযুক্ত পর্যবেক্ষকরা এই সংগঠন চালাচ্ছেন। এখনও পর্যন্ত তাদের কাজে স্বচ্ছতা বজায় রয়েছে। উটকো ঝামেলা ব্রাসা বনাম সিনিয়র খেলোয়াড়দের মধ্যে ধূমায়িত অসন্তোষ কাটিয়ে তোলাই তাদের আশু কর্তব্য।

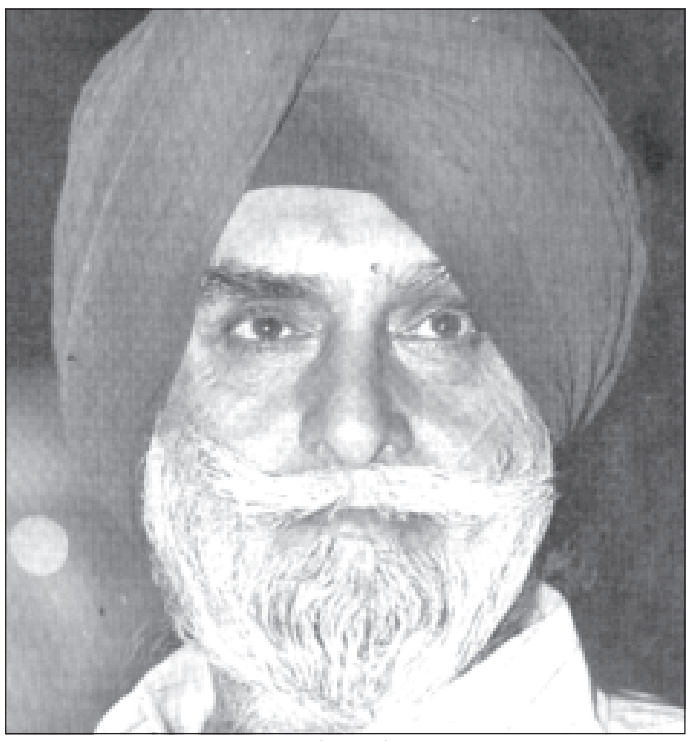

কে পি এস গিল

শব্দরূপ - ৫২৭

ঝর্ণা ঘোষ

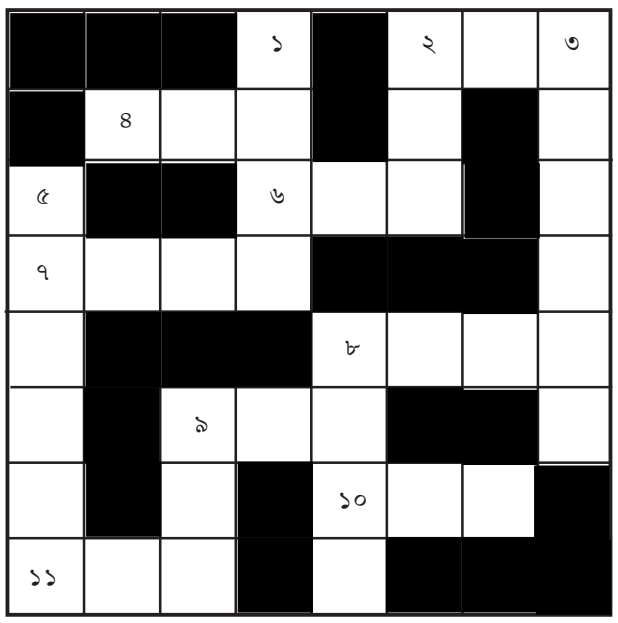

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ২. সরা জাতীয় মাটির বড় গভীর পাত্র বিশেষ, প্রথম ঘরে জননী, ৪. এই যন্ত্রের সাহায্যে হার্টের দোষ-ত্রুটি জানা যায়, ৬. আরবি শব্দে উপলব্ধি, বোধ ৭. আরবি শব্দে পাকাবাড়ি, অট্টালিকা, মধ্যে ধোলাই, ৮. বড়ো গাছকে কৃত্রিম উপায়ে ছোটো করার জাপানি পদ্ধ তি, ৯. দু'দিকে সোনা, ১০. আগাগোড়া করকা, শেষ দুয়ে শিকড়, আসলে তুলোর ফুল, ১১. ইঙ্গ শব্দে হাউই বাজি।

উপর-নীচ ঃ ১. খেলায় বা প্রতিযোগিতায় জয়, প্রথম দু'য়ে ভেলকি, একে-তিনে সুন্দরী নারী, ২. বিশেষণে সমকোণে বিন্যস্ত, ছুতোরে এক যন্ত্রবিশেষ, ৩. এই যন্ত্রের সাহায্যে যে কোনও লেখার হুবহু কপি করা যায়, শেষ তিনে ইঙ্গ শব্দে আচার-ব্যবহার, ৫. এই যন্ত্রের সাহায্যে বাতাসের আর্দ্রতার পরিমাপ করা হয়, আগাগোড়া পরাজয়, ৮. ফরাসি মূল শব্দে ইনাম, প্রথম দু'য়ে সাদা পাখি, ৯. দরজার পাল্লা।

সমাধান শব্দরূপ - ৫২৫

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯।

না	চি	কে	ত	■	■	না	■
■	■	■	থা	র্মো	মি	টা	র
তা	■	■	গ	■	■	■	বি
র	■	ম	ত	■	কী	র্ত	ন
কা	লী	য়	■	ম	ল	■	ন্দি
সু	■	■	■	নো	■	■	নী
র	জ	নী	ক	র	■	■	■
■	না	■	■	মা	র্ক	ণ্ডে	য়

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৫২৭ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৪ ডিসেম্বর ২০০৯ সংখ্যায়

বহুধা বিভক্ত বাংলার টেবল টেনিস

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ একেই বলে সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। চিন্তা-চেতনার দৈন্যতা ও আত্মম্ভরীতাই সুখের সংসারে বিপর্যয় ডেকে আনে। যেমনটা হয়েছে বাংলার টেবল টেনিসের ক্ষেত্রে। এই একটা মাত্র খেলা, যেখানে ক্যাডেট থেকে সিনিয়র — সব স্তরে বছরের পর বছর রাজত্ব করে গেছে বাংলা; এখনো হয়ত করছে। তবে কতদিন এই দাপট থাকবে, তা বলা মুশকিল। রাজনীতি ও ক্ষমতার দালালি বাংলার গর্বের অভিজ্ঞানটিকে ধ্বংস করে দিতে বসেছে।

১৯৭৫ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব টেবল টেনিসের পর থেকেই জোয়ার আসে রাজ্যের টেবল টেনিসে। কলকাতা সহ গোটা রাজ্যের চারপাঁচটি জেলায় এতটাই প্রসারলাভ করে খেলাটি, আর সম্প্রতি তারপর থেকে টানা তিন দশক সব স্তরে এ রাজ্যের ছেলেমেয়েদের সাফল্য ও গৌরবের বিরামহীন পদচারণা। প্রবীর মিত্র ও গোপীনাথ ঘোষের মত কুশলী ও দূরদর্শী সংগঠকরা মিলে বাংলার টেবল টেনিসকে সারা দেশের মধ্যে 'মডেল' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। হঠাৎ কি যে হলো দুই প্রবীণ সংগঠক একে অপরের বিরুদ্ধে ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠলেন। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায়। সু-সংগঠিত বিটিটিএ অর্থাৎ বেঙ্গল টেবল টেনিস অ্যাসোসিয়েশন ভেঙে গেল প্রবীর মিত্রের হঠকারী সিদ্ধান্তে।

বিটিটিএ থেকে বেরিয়ে এসে প্রবীর মিত্র গড়লেন ওয়েস্ট বেঙ্গল টেবল টেনিস অ্যাসোসিয়েশন। আর তার মদতপুষ্ট প্রাক্তন জাতীয় চ্যাম্পিয়ন মান্তু ঘোষ জন্ম দিলেন পৃথক উত্তরবঙ্গ টেবল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের। বলা বাহুল্য, দুই সংগঠনকেই পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা করছেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী ও হেভিওয়েট নেতা, এদের কাজই হল যে কোনও ভাল সংগঠন বা প্রতিপক্ষকে দুর্বল করে দেওয়া। তাদের যাবতীয় গঠনমূলক চিন্তা-ভাবনা ধ্বংস করে দেওয়া। দুর্নীতি ও দৌরাত্ম্য ঢুকিয়ে একের পর এক বাঙালির গর্বের বস্তুগুলোকে সমাজজীবন থেকে মুছে দিয়েছে এই সর্বগ্রাসী বাম নেতৃত্ব। এদের চোখে যেমন হারিয়ে গেছে ব্রতচারী, সব পেয়েছির আসরের মতো প্রতিষ্ঠানের সংস্কার ধর্মী কাজকর্ম ও মূল্যবোধ।

বিটিটিএ-র মধ্যে ছুঁচ হয়ে ঢুকে সাজানো সংসারটিকে প্রায় ধ্বংসের মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে এরা। আর তাদের সঙ্গে সঙ্গত করছে দুই বিবদমান কর্তা প্রবীর মিত্র ও গোপীনাথ ঘোষ স্ব স্ব সংস্থার সাপেক্ষে। দুই কর্মকর্তার জীবনবোধের অবক্ষয় দেখে সত্যিই কষ্ট হয়। এরা কেন সিপিএমের অন্তঃসারশূন্য, অপদার্থ নেতাদের ডেকে আনলেন জনপ্রিয় এই খেলাটিকে শেষ করার জন্য। দুজনে একবারও ভাবলেন না রাজ্যের সর্বত্র হাজারো কুঁড়ি আজ ফুল হয়ে ফোটার অপেক্ষায়। তারা কি করবে? কোন শিবিরে গেলে বড় সুযোগ পাবে? তাদের স্বপ্ন, তাদের সাধনাকে নিয়ে কেন এভাবে ছিনিমিনি খেলছেন প্রবীর মিত্র, গোপীনাথ ঘোষ?

সংশোধনী

স্বস্তিকা'র গত ২৩ নভেম্বর সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ছবিটি দিলীপ সিং ভুরিয়ার নয়। অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য দুঃখিত। —সম্পাদক

গরু হারালে স্ত্রী-কে মানুষ বলে 'মা'

বিশাখা বিশ্বাস

"আই ডোন্ট বিলিভ্ এ্যাস্ট্রোনমি ইজ এ সাইন্স দো মেনি সে ইট ইজ...এ্যান্ড উই উইল হ্যাভ টু বিকাম..."।

চমকিত শিহরিত বিজ্ঞানের সকল শাখার ছাত্র-ছাত্রীগণ। সর্বভারতীয় বিজ্ঞান-আলোচনা চক্রে সারা ভারতের বিজ্ঞানীরা বিস্ময়ে বিমূঢ়। উদ্বোধকের উদ্বোধনী ভাষণে একথা শুনে হতবাক নভশ্চ রগণ। কেবল দীপ্তিরতন তিমির হনন শুভ্ররাগে লুপ্তিধূলায় মশালের ভস্ম বুঝি নিদ্রা যেতে চায়। তখন বেলা ১১টা ২৯ মিঃ—১৭/১১/০৯ তারিখ। তার পর গড়িয়ে গেছে প্রায় ঘণ্টা ছয়েক সময়। রাজ্যের প্রত্যেক টেলিভিশন-চ্যানেলে সারা রাজ্যে ছড়িয়ে গেছে সেই খবর, দ্য স্টেট্স্ম্যানের সাংবাদিক তখন ক্যাপ্সন সাজাচ্ছেন, ইট্স্ অল্ রিটেন ইন দ্য স্টার্স, (লার্নেড) চীফ মিনিস্টার! সংবাদপত্রে, টেলিভিশনে তখন খবর শব্দ গুলিয়ে রাজ্যকে লজ্জায় ফেললেন বুদ্ধ। তখন বিকেল ৫-৩০ মিনিট। মুখ্যমন্ত্রী রাইটার্সে জানালেন, ওটা একটা সামান্য ভুল, আপনারা ওটা ঠিক করে নেবেন।

না, কোন বড় ঘটনা এটা নয়। বড় ঘটনা হচ্ছে, কতখানি উদ্বিগ্নতা, অস্থিরতা, দুঃশ্চি ন্তা এবং ভেঙে পড়া মন হলে মানুষ তার 'স্লিপ্ অফ টাং'-টাকে কেউ ধরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তা বুঝতেই পারে না এবং বিজ্ঞানের আলোচনাকালে বিজ্ঞানকেই খারিজ করে ঘাড়গর্দান নাচিয়ে আঙুল তুলে সেই মানুষই শেষ পর্যন্ত বক্তৃতা চালিয়ে যায়।

কথায় আছে, গরু হারালে মানুষ স্ব-কন্যার জননীকেও বলে 'মা'। একটি গরু হারালে মানুষের যদি এমন মতিভ্রম হয়, তাহলে, বত্রিশ বছরের ভোগের বত্রিশ-সিংহাসন হারাবার দশা সমুপস্থিত হলে তার অবস্থাটা কী 'এ্যাস্ট্রোলজিকে' এ্যাস্ট্রোনমি বলার মতোই নয়?

আসলে, অবরুদ্ধ স্রোতধারা ডেকে আনে প্রলয়-প্লাবনকে—অবরুদ্ধ ঝড়ের বাতাস আমন্ত্রণ জানায় প্রলয় ঝঞ্ঝাকে। সামনে দ্রোহকাল, দলবদ্ধ মূঢ়তার অভ্রভেদী দুর্জয় অহংকারকে ভেঙেচুরে চারদিকে শ্লোগান ওঠে ঃ আমরা বাঁধা থাকবো না দাসের রাজার ত্রাসের রাজত্বে। তাই, গলবদ্ধ শোভিত কমিউনিস্ট দাসেরা যখন গড্ড লিকা প্রবাহে সামিল হচ্ছে, যখন মানুষের অন্তর্জগতকে বাঁধাবুলিতে আচ্ছন্ন করে রাখা হচ্ছে, যখন মেধা ও মননের শক্তিকে লুণ্ঠন করা হচ্ছে, যখন মাটির ওপর স্বাধীন মানুষের জীবন ও জীবিকাকে বিপন্ন করা হচ্ছে—তখন আদিগন্ত আর্ত মানুষের আন্দোলন যে কোন পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, সেই আন্দোলনের সংবেগে কত বর্ণময় স্বপ্ন যে প্রত্যয়িত হতে পারে বত্রিশ বছরের খ্যাতির কাঙাল ভোগের পাট্টাদারেরা আজ তা বুঝতে পেরেছে। গরু হারালে আমাদের কোন্টি যে স্ত্রী এবং কোন্টি যে কন্যা তা মাথায় খেলে না। কুর্সি হারাবার উপক্রম হলে কোন্টি যে এ্যাস্ট্রোলজি এবং কোনটি যে এ্যাস্ট্রোনমি তাও সর্বদাই

লালগড়ে যৌথবাহিনীর টহল

খেয়াল থাকে না। তাই ঘটনাটি ছোট কিন্তু তাৎপর্যে ভয়ংকর—কেননা এদেরই ওপর রয়েছে আমাদের নিরাপত্তার ভার, রাজ্যের সাধারণ মানুষের জীবন এবং জীবিকার দায়িত্ব।

কিন্তু, এমন কেন হচ্ছে?—হচ্ছে এজন্যে যে, এখন হাইটেক রিগিং-এর বাণপ্রস্থে যাবার কাল—ইভিএম মেশিনের যে কোনও বোতামে চাপ পড়লেই এখন আর কেস্তে-হাতুড়িতে ছাপ পড়ে না, কেননা, মরীয়া মানুষ এখন মেশিনের কারসাজি সম্পর্কে অনেক বেশি সতর্ক হয়ে উঠেছেন।

রাজ্যের ১২৭টি হাসপাতাল চালনা করেন এক একজন নার্স। অফিসে-আদালতে কাজ হয় না, কথা বল্লেই টাকা দিতে হয়, আঁতুড়েই দেহ রেখেছে 'ডু ইট নাউ'। "মাওবাদীরা, কেএলও-উলফার চেয়েও ভয়ংকর" কিন্তু তার চেয়ে আরো ভয়ংকর বুদ্ধে র পুলিশ। প্রতিদিন মানুষের ঘর জ্বলছে, মানুষ মরছে। সূচপুরের কবরখানায় কান্না, বিলম্বিত বিচার। তাপসীর কান্না। নন্দীগ্রামের শান্তিমিছিলে স্বয়ংক্রিয় রাইফেলের গুলি বর্ষণের বীভৎসতা, শত শত ধর্ষিতা মহিলার দীর্ঘশ্বাস, নগরায়ন এবং শিল্পায়নের সৌজন্যে। গ্রাম বাংলার উৎখাত হওয়া বৃত্তিচ্যুত কৃষি শ্রমিক মানুষেরা ধীরে ধীরে পরিচয় হারাচ্ছে বামমার্গীদের। বৃত্তিচ্যুত গ্রামীণ কুলবধূরা দলবেঁধে দেহোপজীবিনী হয়ে ভীড় জমাচ্ছে কোলকাতায়, বিভিন্ন শহরে। আশপাশের শহরে উঠে এসেছে ঘরছাড়া সমাজছাড়া হাজার হাজার আদিবাসী-গিরিবাসী-বনবাসী পুরুষেরা, চোখে আগুন, অন্তরে লালগড়ের কান্না। গ্রামে-গঞ্জে ক্যাডার-কর্মীগণ বুদ্ধ কে সভায় সমিতিতে পরিত্যাগ করেছে, শহরেও আর তেমন ডাক নেই বণিকসভাগুলির আলোচনানাচক্রে। পক্ষান্তরে, মমতা ব্যানার্জীকে বারে বারে ইতিহাস এপিটফ বানিয়েছে, বামবাদীরা কতবার তার স্মৃতিফলক বসাবার ব্যবস্থা করেছে, কিন্তু তারই নেতৃত্বে মানুষ জাগরিত হচ্ছে, ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে, প্রতিবাদে গর্জে গর্জে উঠছে। তাই— তাই, মাথায় এখন মন নাই। তাই এইতো সেদিন সেই ২৪শে অক্টোবর ২০০৯-এর ঘটনাটা ঘটলো। দিল্লীর (প্রেস-কর্নারে) কিম্বা কোন কনফারেন্সে তিনি বল্লেন "টু পুলিশমেন— কাঞ্চ ন এ্যান্ড সাবির—এ্যাব্ডাকেটেড বাই মাওইস্টস্ এ ফিউ ডেজ এগো হ্যাড বীন কিল্ড। এবং তারপরেই রাজ্যে ফিরে এসে তিনিই বল্লেন, তারা জীবিত রয়েছেন, শিগগীরই তারা উদ্ধারপ্রাপ্ত হবেন, আপনারা আমার ভুলটা শুধরে নেবেন।...

সামাজিক দর্পণে মাওবাদ

অরূপ নাগচৌধুরী

স্বয়ং মাও-জে-দং যদি আজকের দিনে বেঁচে থাকতেন, তবে তাঁর বিশ্বের সবচেয়ে সুখী মানুষের শিরোপা পাওয়া নিয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ থাকার কথা নয়। ভগবানের অস্তিত্ব নাকি ভক্তের মধ্য দিয়েই প্রতিফলিত হয়। তেমনি মাও-এর অস্তিত্বও প্রকাশ পাচ্ছে মাওবাদীদের মাধ্যমে। তবে এই মাওবাদীরা আসল মাও বিনা এনিয়ে বিদগ্ধজনেরা ভিন্নমত পোষণ করছেন। কেউ বলছেন, এরা মাও-জে-দং-এর নীতি অনুসরণ করে মাওবাদী হয়েছেন। আবার কারুর মতে মাও-কে বাদ দিয়েই এরা নাকি মাওবাদীরূপ ধারণ করেছেন। আর এই চাপান উতোরেই সরগরম রাজ্য রাজনীতি তো বটেই, এমনকী রাজধানীর রাজনীতিও। তবে এই মার্কামারা মাওবাদীদের ঘনিষ্ঠ হলে ভোটে অনিষ্ট যে বিলক্ষণ তা টের পেয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাল্টা আক্রমণে একদা নকশালী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে তাই মাওবাদীদের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। এবং বুদ্ধ বাবুর সিপিএম পশ্চি মবঙ্গে পার্টির গণেশ ওল্টানোর বিস্তর কারণ অনুসন্ধান করার পরে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, অশরীরি মাওবাদী আর তৃণমূলী মিলেই জনগণকে খেপাচ্ছে ও সেইসঙ্গে রাজ্যটাকে গোল্লায় পাঠাচ্ছে। আসলে এই মাওবাদী যে কারা তা ঠাওর করতে গিয়ে বেজায় মুশকিলে পড়েছে বটে সিপিএম। তাদের সর্বভারতীয় বস প্রকাশ কারাত আজন্ম লালিত ও পালিত হয়েছেন মাও জে দং-এর বিশ্বাসে। সিপিএমের সর্বভারতীয় সেকেন্ড কম্যান্ড সীতারাম ইয়েচুরি বহুবার নেপালে গিয়ে সেখানকার শাসক মাওগোষ্ঠীর সর্বোচ্চ নেতা প্রচণ্ডের সঙ্গে বিস্তর আটি-চাটি মেরে এসেছেন। কিন্তু পুরো সিপিএম পার্টিটা মাও-গেরোয় পড়েছে এরাজ্যে এসে। পশ্চি মবঙ্গ সহ চার রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাওনেতা কোটেশ্বর রাও ওরফে কিষেণজী তাদের কাছে দু'চোখের বিষ একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। অথচ একদিন এই 'কিউট' মাওবাদীরাই ছিল সিপিএম-এর সবচেয়ে নিকটতম বন্ধু (আদর্শগত কারণে?!)। সুতরাং বর্তমানে চলা 'মাওবাদ'কে ডিফাইন করতে গিয়ে অসংলগ্ন কথা বলছেন সিপিএম নেতারা। তাঁদের আচরণ-এ ফুটে ওঠা নির্ভেজাল হাস্যরসে কমেডি শো-এর মজা লুটছেন মধ্যবিত্ত বাঙালি।

মাওবাদ বিতর্কে মধ্যবিত্তের নামোল্লেখ না করলে তা ঘোরতর অন্যায় হবে। সাতের দশকে মধ্যবিত্তের কাছে নকশাল আন্দোলন ছিল রোম্যান্টিক বিপ্লবে ভরা, নয়ের দশকের শেষদিকে এরাজ্যের পুলিশমন্ত্রী বুদ্ধদেবের আমলে রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের শিক্ষককে বিনা দোষে জেলে পুরে দেওয়া ও অমানবিক অত্যাচার---মাওবাদ সম্পর্কে মধ্যবিত্তের মনে একটা অজানা আতঙ্কের সৃষ্টি করে আর বর্তমানে ল্যাজে-গোবরে বুদ্ধ-প্রশাসনের মাওবাদী ট্যাকেল স্রেফ চায়ের পেয়ালায় মুচমুচে মুখোরোচকের স্বাদ এনে দিয়েছে মধ্যবিত্তের। টিভি খুললেই লালগড়ের লাইভ সম্প্রচার। মধ্যবিত্তের একেবারে রিয়েল এন্টারটেনমেন্ট শো। এর কাছে যেন পানসে ঠেকছে সব ধরনের রিয়েলিটি শো-ও। টিভি কর্তারা ঠিকই ধরেছেন--চপ-কাটলেট ছেড়ে কারুর কি আর তেলেভাজায় মনে ভজে!

টিভি কম্পিউটার, উত্তর-আধুনিকতার যুগে দুপুরবেলা বিছানায় শুয়ে ঠাকুমা-দিদিমার কাছে বিশেষ করে ভূতের গল্প শোনার দিন অন্তর্হিত হয়েছে বহুদিন আগেই। এই মাওবাদী বাজারে সেই আমল ফিরে এলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। লক্ষ্য করে দেখবেন, কিষেণজীর কণ্ঠস্বর কোটি কোটি শ্রোতার বহুবার কর্ণগোচর হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি তাঁর চেহারার পূর্ণাবয়ব (মুখ ঢাকা) পর্যন্ত টিভির পর্দায় বারংবার ফুটে উঠেছে। অথচ তাঁর মুখদর্শন কতিপয় সাংবাদিক করলেও করতে পারেন কিন্তু জনসাধারণ করেননি। এমন আশ্চ র্য, অশরীরি ব্যাপার-স্যাপার হার মানাবে মামদো থেকে ব্রহ্মদৈত্যির গা-ছমছমানো গল্পকেও। ড্রাকুলা-ডাইনোসর কিংবা অরণ্যদেব-টারজান ছেড়ে ছোটদের হট-ফেভারিট এখন আরণ্যক কিষেণজী।

এবার বলতে হয় সাংবাদিকদের কথা। তাঁরা মায়ের পেট থেকে পড়া ইস্তক বুর্জোয়া। যার সবচেয়ে জোরদার প্রমাণ, সাংবাদিকদের ছদ্মবেশে মাওবাদী আউটফিট ছত্রধর মাহাতোকে গ্রেপ্তার। তারপরেও সাংবাদিকদের জামাই আদর করে ডাকছেন কিষেণজী, এমনকী তাদের পদোন্নতির জন্যে কি অসাধারণ সব বাইট দিয়ে চলেছেন! এছাড়াও এতে আরও একটা জিনিস প্রমাণিত হচ্ছে। গভীর জঙ্গলে মোবাইলের টাওয়ার পাওয়া যায় না---এই অভিযোগ ডাহা মিথ্যে!

কিন্তু কেমন আছে জঙ্গলমহল? না খেতে পাওয়া, রোগে-ভোগা হাড্ডিসার সেই মানুষগুলো? মার্কস রাখি না মাও রাখি---এই নিদারুণ অবস্থায় যাঁরা জীবন-মরণের প্রান্তসীমায় এসে দাঁড়িয়েছেন। শালপ্রাংশু গহন অরণ্যে যৌথবাহিনীর যে বুট মাড়িয়ে দিয়েছে তাদের রক্তভেজা কচি কচি ঘাসগুলোকে। যাদেরকে মূলধন করে এই মুহূর্তে রমরমা বাজার কিষেণজীর। যাদের নিয়ে তরজায় ব্যস্ত বুদ্ধবাবু ও মমতাদেবী। জঙ্গলমহল সে সুখে নেই, একথা না বললেও চলে। আদিবাসীদের নিয়ে কাজ করা বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী পশুপতি প্রসাদ মাহাতো এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন সমাজের ব্রাহ্মণ্যবাদী ষড়যন্ত্র। তিনি বলছেন, সিপিএমে যেমন রয়েছে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বিমান বসু। তৃণমূলে রয়েছে মমতা ব্যানার্জি, পার্থ চ্যাটার্জি। এমনকী মাও নেতা কোটেশ্বর রাও-ও তো ব্রাহ্মণ। সুতরাং সাঁওতাল, কুর্মী, হাড়িয়া, শবর, মাহাতো সমাজের এই পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য ওই বামুন-কায়েতরা নাকি কিছুই করবেন না। এমনটাই অভিমত পশুপতিবাবুর। যে বক্তব্যকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিচ্ছেন সিপিআই এমএল লিবারেশনের রাজ্য সম্পাদক কার্তিক পাল। কার্তিকবাবুর বক্তব্য, এই মাওবাদীদের সঙ্গে মাও জে দং-এর কোনও সম্পর্ক নেই। সামন্ত্রতান্ত্রিক প্রথাই এই ধরনের মাওবাদকে উৎসাহিত করছে বলে মনে করছেন কার্তিকবাবুরা। অন্যদিকে জঙ্গলমহলের স্কুলে কেন সাঁওতালী, কুর্মালী ভাষায় শিক্ষাদান করা হয় না তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পশুপতিপ্রসাদ মাহাতো। তিনি বলছেন, 'মার্কসিজম ইজ আ মিথ'। কার্তিকবাবুর মতে, রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ঠিক সুসম্পর্ক নয় কিন্তু একটা আঁতাত রেখেই চলে এই তথাকথিত মাওবাদীরা। উদাহরণ---অন্ধ্রপ্রদেশে চিরঞ্জীবির দল, বিহারে আরজেডি। তাঁর ইঙ্গিতটা দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার। এরাজ্যে মমতা কিংবা সিপিএম---মাও যোগাযোগে কেউই সন্দেহের ঊর্ধে নয়। তবে নিজেদের সেই সন্দেহের থেকে একেবারেই বাইরে ফেলতে চাইছে কার্তিকবাবুর সি পি আই এম এল (লিবারেশন)। যা শুনে কেউ কেউ বলছেন, নিজের সঙ্গে মার্কস-লেনিনের এতটা বাজে সম্পর্ক শুনলে সিওর আত্মহত্যা করতেন মাও।

সামাজিক প্রেক্ষাপটে জমে উঠেছে তরজা। হারিয়ে যেতে বসেছে জঙ্গল-মহলের প্রেক্ষিতটাই। আঁধার নেমেছে চিন্তামণির চোখে। অসহায়ভাবে গুমরে গুমরে কেঁদে মরছে অশান্ত অরণ্যানি, জঙ্গলমহল। একটা গুমোট প্রশ্ন মনের মধ্যে বারবার এসে উঁকি মারছে। আজ বেঁচে থাকলে কোন ছবিটা আর একবার করতে চাইতেন সত্যজিত রায়? সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের অরণ্যের দিনরাত্রি না কি শংকরের জন-অরণ্য?

Swastika
30 November - 2009, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

পুস্তক উদ্বোধন করছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। সঙ্গে ডঃ করুণাসিন্ধু দাস, অশোকমোহন চক্রবর্তী ও অন্যরা।

জগদীশচন্দ্র বসুর জন্ম সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন

‘বেকার ল্যাবরেটরি’র নাম ‘জগদীশচন্দ্র’ রাখার দাবি

নির্মল মাইতি ঃ গত ১৩ ও ১৪ নভেম্বর দুইদিন ব্যাপী বাংলা ভাষায় একটি বিজ্ঞান সম্মেলন আয়োজিত হলো প্রেসিডেন্সী কলেজ প্রাঙ্গণে। সম্মেলনে প্রায় চারশো ছাত্র-ছাত্রী এবং অসংখ্য শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষানুরাগী মানুষ এতে যোগাদান করেছিলেন। এর আয়োজক ছিল আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর দেড়শ’তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিজ্ঞান ভারতী এবং বসু বিজ্ঞান মন্দিরের যৌথ উদ্যোগে গঠিত ‘জগদীশ চন্দ্র বসু সার্ধশত জন্মজয়ন্তী বর্ষ উদযাপন সমিতি’। সমগ্র অনুষ্ঠানের বিশেষত্ব প্রধানত একটাই। তা হলো—সমগ্র অনষ্ঠানটি একটি সর্বভারতীয় বিজ্ঞান সংস্থা অর্থাৎ বিজ্ঞান ভারতী’র পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বসু বিজ্ঞান মন্দিরের আন্তরিক সহযোগিতায় আগাগোড়া পরিচালিত হয়েছে বঙ্গভাষায়। যা নিঃসন্দেহে অভিনব। ল্যাটিন-গ্রীকের অভিভাবকত্ব (বিজ্ঞানসম্মত নামের ক্ষেত্রে) কাটিয়ে এবং ইংরেজির (বিজ্ঞানের পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে) আধিপত্য থেকে বেরিয়ে এসে বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানচর্চা যে ক্রমশ সাবালকত্ব অর্জন করছে এই সম্মেলন তা আরও একবার প্রমাণ করল। লক্ষণীয়, যাঁর জন্ম সার্ধশতবর্ষে (অর্থাৎ জগদীশচন্দ্র বসুর) এই আয়োজন, তাঁর হাত ধরেই শৈশব অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হয়েছিল বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান চর্চা।

সম্মেলন উপলক্ষে, সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বিজ্ঞান ভারতী’র পশ্চিমবঙ্গ শাখা (বিবেকানন্দ বিজ্ঞান মিশন) প্রকাশিত জগদীশ চন্দ্র ও লেডি অবলা বসুর রচনা সংকলন উন্মোচন করেন। তাঁর আক্ষেপ —“এখনকার বিজ্ঞানীরা বাংলায় লেখেন না, তারা ইংরেজিতে লেখেন।” অনুষ্ঠানের উদ্বোধক রাজ্য সরকারের মুখ্যসচিব অশোক মোহন চক্রবর্তী ১৫০টি শিখা-যুক্ত একটি বৈদ্যুতিক প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ করুণাসিন্ধু দাস। তিনি তাঁর বক্তব্যে ভারতের গৌরবময় প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরেন।

এই সম্মেলনের মুখ্য আকর্ষণ—উপস্থিত বিজ্ঞানীদের জগদীশ চন্দ্র বসু এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা। নাসার বিজ্ঞানী আমেরিকার হাউস্টনের বাসিন্দা ডঃ প্রবীর মুখোপাধ্যায় বলেন—“ইউরোপে এবং লন্ডনে রয়াল সোসাইটিতে জগদীশ চন্দ্র বসুর চমৎকার পরীক্ষা প্রদর্শন দেখেন লর্ড কেলভিন সহ কুড়ি জন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী। তাঁরা ভারত সরকারের কাছে জগদীশ চন্দ্রের জন্যে একটি উপযুক্ত ল্যাবরেটরির ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানান। কিন্তু তৎকালীন বাংলার গভর্নর এডওয়ার্ড নর্মান বেকার-এর চক্রান্তে তা সম্ভব হয়নি। দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই বেকারের নামে ‘বেকার ল্যাবরেটরি’ হয়েছে। স্বাধীনতার পরও আমরা তা বজায় রেখেছি। তাই অবিলম্বে বেকারের নাম মুছে দিয়ে জগদীশ চন্দ্রের নামে এই ল্যাবরেটরির নামকরণ করতে হবে।”

অনুষ্ঠানের আকর্ষণ বাড়িয়ে বিড়লা তারামণ্ডলের নির্দেশক ডঃ দেবীপ্রসাদ দুয়ারি জ্যোতির্বিজ্ঞানে তারাদের বিস্ময়কর জীবনকথা আলোচনা করেন। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অব্ সায়েন্স-এর নির্দেশক ডঃ কঙ্কন ভট্টাচার্য চীনের অত্যধিক গবেষণাপত্র নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন—“ অর্থনৈতিকভাবে ভারত বিশ্বে ১৪০ তম হলেও গুণবত্তাসম্পন্ন গবেষণা-পত্র প্রকাশনায় ভারত দশম স্থানে। চীনের অত্যধিক গবেষণাপত্র প্রকাশনা সন্দেহজনক। কারণ চীন অনেকসময় এক গবেষণাপত্র দু’বার প্রকাশ করে।”

দু’দিন ব্যাপী ওই অনুষ্ঠানে ছাত্রদের জন্য একগুচ্ছ কর্মসূচী—যেমন জগদীশচন্দ্রের জীবন ও বাণীর উপর প্রদর্শনীর আয়োজন করা, বিজ্ঞানে ভারতের অবদান শীর্ষক পোস্টার প্রতিযোগিতা, বিজ্ঞান মডেল প্রতিযোগিতা, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতা, বৈজ্ঞানিক যন্ত্র প্রদর্শন ইত্যাদি গৃহীত হয়েছিল।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে পদ্মভূষণ ডঃ সরোজ ঘোষ বক্তব্য রাখেন। এছাড়া সমাপ্তি ভাষণ দেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্য ডঃ ধ্রুবজ্যোতি ভট্টাচার্য। অংশগ্রহণকারীদের সবাইকে একটি শংসাপত্র দেওয়া হয়।

ভারতের শাশ্বত সংস্কৃতির সাধনা করছে সংস্কার ভারতী – স্বপ্না চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি।। সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক সংস্থা সংস্কার ভারতী’র উত্তরবঙ্গ প্রান্তের প্রাদেশিক শিল্পী সম্মেলনের আয়োজন হয়েছিল মালদা শহরে। গত ১৩,১৪,১৫ নভেম্বর তিনদিনের সম্মেলনে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিনিধিরা উপস্থিত হন শহরের অরবিন্দ পার্কের সরস্বতী শিশু মন্দিরে। এই সম্মেলনের মূল সুর বাঁধা ছিল উত্তরবাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোক সংস্কৃতির আধারে। তাই সাংগঠনিক আলোচনার প্রচার ও প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ার জন্য প্রস্তাব নেওয়া হয়।

বক্তব্য রাখছেন স্বপ্না চক্রবর্তী (বাঁদিকে), শিল্পীদের সমবেত ভাবসঙ্গীত।

সমবেত সঙ্গীত শিল্পীদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় উপস্থিতি ও আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মত।

১৩ নভেম্বর সন্ধ্যায় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ও শাখার শিল্পীরা একত্রিত হন শিশু মন্দির সভাকক্ষে। উদ্বোধনী সত্রে সংস্থার পূর্বাঞ্চল প্রমুখ সুভাষ ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে সাংগঠনিক আলোচনার মাধ্যমে সম্মেলনের সূচনা হয়। অনুষ্ঠিত হয় প্রতিযোগিতা মূলক অনুষ্ঠান। ১৪ নভেম্বর গঙ্গাবাগ মাঠ থেকে শিল্পীদের নিয়ে একটি সুদৃশ্য শোভাযাত্রা মালদা শহর পরিক্রমা করে মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে পৌঁছায়। সকলের হাতে ছিল ভারতীয় সংস্কৃতিকে রক্ষা করা ও কুরুচিপূর্ণ বিজ্ঞাপন, ছবি বন্ধ করার দাবী সম্বলিত বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড।

সন্ধ্যায় তিনদিনের সম্মেলনে আগত শিল্পীদের নিয়ে প্রকাশ্য অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। প্রকাশ্য অনুষ্ঠানের উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলা সংগীত জগতের খ্যাতনামা শিল্পী ‘লোক সম্রাজ্ঞী’ স্বপ্না চক্রবর্তী। সংস্কার ভারতী, সিউড়ি শাখার সভানেত্রী স্বপ্না চক্রবর্তী ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। অনুষ্ঠানের প্রাস্তাবিক ভাষণে স্বপ্না চক্রবর্তী বলেন, ভারতের শাশ্বত সংস্কৃতি ও সারস্বত সাধনার সঙ্গে বর্তমান প্রজন্মের পরিচয় করিয়ে দেবার লক্ষেই সংস্কার ভারতী কাজ করে চলেছে। তাই আমার মতো আপনারা সকলেও সংস্কার ভারতীর সঙ্গে যুক্ত হন।

অনুষ্ঠানে সংস্থার পূর্বাঞ্চল প্রমুখ সুভাষ ভট্টাচার্য বলেন, সমাজ জীবনকে পরম্পরাগত সংস্কৃতি মনস্ক করে তোলার লক্ষেই সংস্কার ভারতী’র প্রতিষ্ঠা। সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত সিউড়ি শাখার সৃজনশীল নৃত্য ও ‘পণপ্রথা কুপ্রথা’ বিষয়ে মানুষ পুতুল নাটিক দর্শকদের মুগ্ধ করে।

এই সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বেতার শিল্পী জগন্নাথ দে, সুভাষ ভট্টাচার্য, মানস চক্রবর্তী, অজয় ব্যানার্জী, দীনেন দে, সুধাংশুজ্যোতি রায় প্রমুখ। শিল্পীদের এই অনুষ্ঠানে স্মারক ফলক দিয়ে সম্মানিত করা হয়। দেশাত্মবোধক গান, নৃত্য নাটিকা, স্বপ্না চক্রবর্তীর স্বকণ্ঠে বিখ্যাত লোকসংগীত ‘বড়লোকের বিটি লো-লম্বা লম্বা চুল’ “ও ননদী আর দু মুঠো চাল ফেলেদে হাঁড়িতে’ দর্শকদের আনন্দ-উৎসাহ বর্ধন করে। সব মিলিয়ে কলেজ অডিটোরিয়ামে দর্শকের আসনে বসে থাকা শ’তিনেক মানুষ সত্যিকারের এরকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনেক দিন দেখেনি। সংস্কার ভারতী সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও সংবর্ধন করার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

প্রকাশিত হবে ৭ ডিসেম্বর ’০৯
স্বস্তিকা
প্রকাশিত হবে ৭ডিসেম্বর ’০৯
আগামী সংখ্যার আকর্ষণ
জন্মভূমিকে জননী বলা হলেও নারীকে তার যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে আইনি সংরক্ষণের জন্য আজও দরবার করতে হয়। সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সময় নারীর সমস্যাগুলির ছিল অগ্রাধিকার। আজ অবস্থাটা কি আদৌ পালটেছে? বিশেষত, মোল্লাতন্ত্রের নাগপাশ থেকে মুসলমান মেয়েদের মুক্তি। সবকিছু নিয়েই আগামী সংখ্যার বিশেষ বিষয়—মহিলা সংরক্ষণ বিল।
।। নিয়মিত আকারেই প্রকাশিত হবে।। দাম একই থাকছে।।

Steelam
EXCLUSIVE FURNITURE
স্টীলম ত্রর ..... পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে
Exclusive Show Room
দেওয়া হইবে॥
Factory :- 9732562101
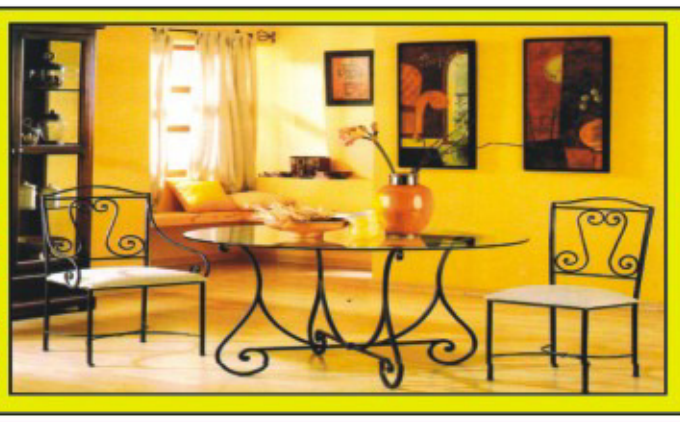

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com